টাইগার'স জাম্পিং ক্লাব ও অন্যান্য রম্য

আহসান হাবীব

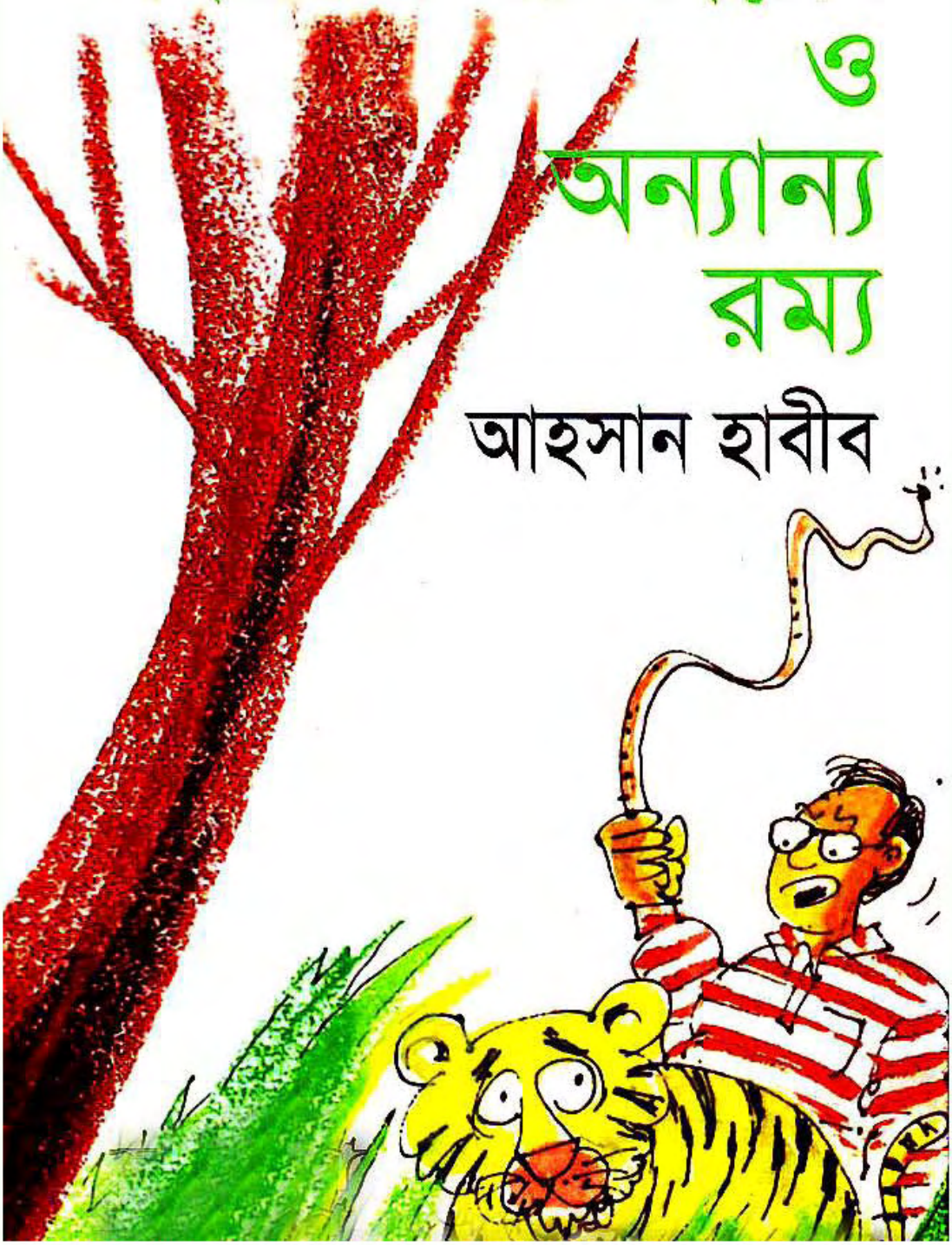

ভূমিকা

'টাইগারস জাম্পিং ক্লাব' আমার নিজের পছন্দের একটি গল্প। আমাদের দেশে রম্যরচনা আছে প্রচুর কিন্তু রম্যগল্প কিন্তু খুবই কম। আর তাই এই গল্পটিকে সামনে রেখে পিছনে রম্য রচনার রেনডম মিছিল। এই মিছিলে নতুন পুরাতন রম্য রচনা আছে বেশ কিছু। পুরাতন গুলোকে একটু মেরামত করার চেষ্টা করেছি।

এই বই পাঠকের ভাল না লাগলেই বরং আমি খুশি। তাহলে পাঠক আমার বই কিনবে না। আমাকেও লিখতে হবে না। তখন কার্টুনে মনোযোগ দেয়া যাবে। হাঃ হাঃ!

সবাইকে শুভেচ্ছা।

আহসান হাবীব
উন্মাদ কার্য্যালয়, মিরপুর
ঢাকা।

টাইগারস জাম্পিং ক্লাব

অবশেষে মোতালেব সাহেব ঠিক করলেন তিনি আত্মহত্যা করবেন। কারণ এছাড়া তার আর কিছু করণীয় নেই। তিনি হঠাৎ করে আবিষ্কার করেছেন তাকে আসলে কেউ পছন্দ করে না। তার স্ত্রী করে না, তার ছেলেমেয়েরা করে না, তার অফিস্ কলিগরা পর্যন্ত করে না। কাজেই ইদানীং তিনি বেঁচে থাকার আগ্রহ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন। অনেকের বন্ধু-বান্ধব থাকে তার সেটাও নেই। অতএব একটাই পথ খোলা... বিদায় হে পৃথিবী!

বিষয়টু প্রথম তিনি একদিন তার স্ত্রীকে অফিসিয়ালী জানালেন–

তোমার সাথে একটা জরুরি কথা আছে।

আমার সাথে আবার জরুরি কথা কী? যথেষ্ট বিরক্তির সাথে স্ত্রী বললেন

আমি ঠিক করেছি সুইসাইড করব।

কী সাইড?

সুইসাইড

করো। একটু সাইড দাও। আমি এখন শুব।

মোতালের সাহেবের সন্দেহ হলো তবে কি সুইসাইড ব্যাপারটা তার স্ত্রী ঝর্না বুঝল না?

আমি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মোতালেব সাহেব পরিষ্কার করে বললেন আবার।

বললাম তো ... আত্মহত্যা, সুইসাইড, সেমসাইড... যা ইচ্ছা করো আমাকে আর জ্বালিও না সাইড দাও।

কালই করব।

তাই কর তবে বাজারটা করে দিয়ে তারপর করো। মাসের বাজার কিন্তু শেষ।

বলে স্ত্রী পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল এবং মুহূর্তে নাক ডাকার মিহি একটা শব্দ শুরু হয়ে গেল। মোতালেব সাহেব হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। এই তার

স্ত্রী? একে তিনি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন? তিনি উঠে পড়লেন। ছেলের রুমের সামনে গিয়ে আস্তে করে টোকা দিলেন।

কে মা? ভিতরে আসো

বাবাকে দেখে ছেলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। কারণ বাবা সচরাচর তার রুমে ঢুকেন না। মাই আসেন।

কী ব্যাপার বাবা?

তোর সঙ্গে একটা জরুরি আলাপ আছে

বলো

আমি কাল আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি!

ওয়াও... গ্রেট।

ব্যাপারটা ফান না সিরিয়াস। মোতালেব সাহেব গম্ভীর গলায় বলার চেষ্টা করেন।

অফকোর্স সিরিয়াস আমিও সিরিয়াসলি নিয়েছি বিষয়টি। কিন্তু বাবা কীভাবে করবে কিছু ঠিক করেছ?

মানে?

মানে কীভাবে আত্মহত্যা করবে কিছু ভেবেছো? মানে বিষ খাবে না ফাঁসিতে ঝুলবে, নাকি ট্রাকের সামনে ঝাঁপ দিবে... অবশ্য এসবই সব ওল্ড ট্রিকস।

না এখনো ভাবি নি

বাবা এক মিনিট আমি ইন্টারনেটে একটা সার্চ দিয়ে দেখি 'সুইসাইড ডট কমে' কী কী অপশন আছে।

মোতালেব সাহেব হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। ছেলে ইন্টারনেটে কী সব ঘাটাঘাটি করল। তারপর উৎফুল্ল স্বরে বলল পেয়েছি!

কী পেয়েছিস?

তুমি হারিকিরি করো

মানে?

মানে জাপানি স্টাইলে আত্মহত্যা করা আরকি। এটা খুবই সম্মানজনক। আর জাপান এ্যাম্বেসিতে যদি একবার জানানো যায় তুমি জাপানি স্টাইলে হারিকিরি করেছ, ওরা আমাদের মাথায় নিয়ে নাচবে। ইন ফেক্ট আমি হয়তো ফ্রি জাপানও চলে যেতে পারব তোমার ছেলে হিসেবে। বলা যায় না। আমাদের ফ্যামিলি 'সামুরাই পদক' পেয়ে যাবে। হারিকিরি করতে সামুরাই সোর্ড লাগে বলে শুনেছি...

মোতালেব সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি এবার মেয়ের দরজায় টোকা দিলেন।

কে বাবা? ভিতরে এস। আশ্চর্য টোকা দিলেই মেয়েটা কীভাবে বুঝে যায়, মোতালেব সাহেব ভিতরে ভিতরে আশ্চর্য হন। সত্যিই মেয়েদের সিক্সথ সেন্স কাজ করে? কে জানে! তিনি দরজা ঠেলে ঢুকে যান। মেয়ে শুয়ে শুয়ে হুমায়ুন আহমেদ-এর কোনো বই পড়ছিল।

কী ব্যাপার বাবা এত রাতে?

তোকে একটা জরুরি কথা বলতে এলাম।

কী সেটা?

আমি...

থামলে কেন? বলো?

আমি আগামী কাল আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি

ওহ্ গ্রেট বাবা আমিও একজন পার্টনার খুঁজছিলাম।

মানে?

মানে আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি সুইসাইড করব। পার্টনার পাচ্ছিলাম না, একা একা একটু ভয় ভয় লাগে তো...

তুই কেন সুইসাইড করবি?

ধুর বোরিং লাইফ বাবা... আড্ডা ক্লাশ এসএমএস... মোবাইল সব ফালতু... আচ্ছা বাবা কীভাবে করবে কিছু ঠিক করেছ?

মোতালেব সাহেব মাথা নাড়েন।

শোনো আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। তুমি আর আমি দুজনে একটা জঙ্গলে চলে যাব... সেই যে কবি জীবনানান্দ দাশের কবিতার মতো এক গাছা দড়ি হাতে তব একা একা... তারপর দুজনে দুটো ভালো দেখে গাছ বেছে নিয়ে ঝুলে পড়ব। আমাদের সঙ্গে নেয়া টেপ রেকর্ডারে তখন বাজতে থাকবে রবীন্দ্র সঙ্গীত... সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে...। মেয়ে চোখ বন্ধ করে মাথা দুলিয়ে গানটা গাইতে থাকে। মেয়ের গলা ভালো কিন্তু এই মুহূর্তে অসহ্য বোধ হলো, মোতালেব সাহেব উঠে পড়লেন। এদের মধ্যে গভীরতার ব্যাপারটাই নেই। তার জানানোর দরকার ছিল তিনি জানিয়ে দিলেন।

পরদিন খুব ভোরে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তিনি যে সুইসাইড করবেন তাতে নিশ্চিত কিন্তু কীভাবে করবেন তা জানেন না। হাঁটতে হাঁটতে একটা বাস

স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালেন। বড় বড় সুন্দর বাস। খুলনার বাস। কী মনে হলো চট করে উঠে পড়লেন খুলনার বাসে। খুলনা তার স্মৃতির শহর। ছোট বেলাটা খুলনার খালিশপুরে কেটেছে। বলাই বাহুল্য সেখানেই তার স্ত্রী ঝর্নার সাথে পরিচয়। আহা যৌবনের কী সুন্দর সব স্মৃতি। কিন্তু... মোতালেব সাহেব মাথা থেকে ঝেটিয়ে সব সরালেন। নাহ আবেগপ্রবণ হওয়া চলবে না। জীবনের প্রতি আর কোনো মোহ আনা চলবে না। তিনি যে প্ল্যান নিয়ে বের হয়েছেন সেটা কার্যকর করা জরুরি। কিন্তু কীভাবে? আর তখনই তার মাথায় আইডিয়াটা ক্লিক করল। আচ্ছা খুলনা যাচ্ছেন সেখানে থেকে সোজা সুন্দরবন... তারপর বনের ভিতর ঢুকে পড়তে পারলে কোনো বাঘ কি তাকে একটু দয়া করবে না? তিনি আর ভাবতে পারেন না-অসাধারণ আইডিয়া তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঝুঁকি আছে, নির্মমতা আছে তারপরও সঙ্গে এ্যাডভেঞ্চারও আছে। সারাটা জীবন তো একটা অর্ডিনারি মানুষের মতো কাটিয়ে দিলেন। শেষ বেলায় এসে একটু এ্যাডভেঞ্চার খারাপ কী? তিনি ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আর ঠিক তখনই পকেটের মোবাইলটা বেজে উঠল। হায় হায়। ভুল করে মোবাইলটা নিয়ে চলে এসেছেন। হাতে নিয়ে দেখেন ঝর্নার ফোন?

হ্যালো ???... গোছো কোন চুলায়? বাজার করতে হবে মনে নেই?... বাকি কথাগুলো শোনার প্রয়োজন মনে করলেন না।

মোতালেব সাহেব। আস্তে করে মোবাইলটা বাসের জানালা দিয়ে বাইরে ছেড়ে দিলেন।

ওকি করলেন?

মোতালেব সাহেব চমকে তার সহযাত্রীর দিকে তাকালেন। তার আসলে খেয়ালই নেই পাশে একজন যাত্রী আছে 'এত দামি মোবাইলটা ফেলে দিলেন?'

না মানে ঠিক করেছি আর মোবাইল ব্যবহার করব না।

কেন?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মোতালেব সাহেব, তারপর বললেন, 'দেখেন ভাই পিছনের ইতিহাস অনেক লম্বা। বলা সম্ভব না... তবে এইটুকু জেনে রাখুন আমি এই জীবন থেকে বিদায় নিচ্ছি... গুড বাই... ফেয়ার ওয়েল টু দ্যা লাইফ'।

বলেন কী? তরুণ সহযাত্রী উৎসাহিত হয়ে উঠেন।

বাকি পথ মোতালেব সাহেব কথাবার্তায় ভালোই কাটালেন। অল্পবয়স্ক সহযাত্রীকে তার পছন্দ হয়েছে, সহযাত্রীও তার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী।

স্যার যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব?

বলো।

স্যার সুন্দরবন যাওয়ার আগে আমার বাসায় দুটা দিন থেকে যান

নারে ভাই সেটা সম্ভব না।

কেন স্যার?

যত দ্রুত আমি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি সেই চেষ্টাই আমি করব।

না স্যার। এ হয় না।

মানে?

আপনার মতো লোক এ দুনিয়া থেকে চলে গেলে... কী বলেন আপনি...?

মোতালেব সাহেবের শুনতে ভালো লাগে অন্তত একজন ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিয়েছে। তিনি তার কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করলেন 'আমার ভালো লাগছে শেষ বেলায় তোমার মতো একজন ভালো ছেলের সন্ধান পেলাম... তবে একটা কথা মনে রেখো এই জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী... বরং মৃত্যু হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী একটা প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ার ভিতরে আমাদের সবাইকে ঢুকতে হবে... জ্ঞানের বাক্যটি শেষ করতে পেরে ভালো লাগে মোতালেব সাহেবের।

সুন্দরবনের কটকা রেঞ্জ দিয়ে ঢুকে পড়লেন মোতালেব সাহেব। একটা সাইনবোর্ড-এর পাশ ঘেঁষে তিনি কাউকে বুঝতে না দিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন। সাইন বোর্ডটায় বড় বড় করে লেখা 'সাবধান রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' আশ্চর্য হয়ে মোতালেব সাহেব আবিষ্কার করলেন তার এক বিন্দু ভয় করছে না। তিনি সাবধানে উপরের দিকে সুইয়ের মতো উঠে আসা সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছেন গভীর জঙ্গলের দিকে। কী সুন্দর জঙ্গল। এই তো কিছুদিন আগেও সিডর ঝড় এই জঙ্গলকে তচনচ করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন কী সুন্দর তারা গা ঝাঁড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি গাছ কী সতেজ, সবুজ। ঠিক তখন তিনি একটি বাঘের গর্জন শুনলেন। বনভূমি কেঁপে উঠল। মোতালেব সাহেব প্রস্তুত হলেন। বাঘ সাধারণত মানুষের ঘাড়ে কামড় দেয়, বইপুস্তকে সেরকমই পড়েছিলেন। ঘাড়টাকে প্রস্তুত করা দরকার। রুমাল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছলেন। শুচিবায়ু বাঘ হলে বিরক্ত হতে পারে।... এই সময় জঙ্গল তচনচ করে ভারী কিছু একটা ছুটে আসছে বলে মনে হলো মোতালেব সাহেবের। হ্যাঁ বাঘ বাঘই বটে বাংলার বিখ্যাত বাঘ দ্যা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যেন সিডর ঝড়ের মতো ছুটে আসছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোতালেব সাহেবের হঠাৎ মনে হলো জীবনটা কি তিনি সত্যিই খুব খারাপ

কাটিয়েছিলেন? না বোধ হয়... তারপরও কেন তিনি আত্মহত্যা করতে এলেন? বাঘটা এখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি একটা বোটকা গন্ধ পাচ্ছেন বাঘটা হাঁপাচ্ছে। এখনি কি তার উপর ঝাঁপ দিবে...?? তিনি প্রস্তুত!

কিন্তু অনেকক্ষণ হলো বাঘটা যখন ঝাঁপ দিল না, তখন ঘুরে দাঁড়ালেন মোতালেব সাহেব। হ্যাঁ বাঘ যে কোনো সন্দেহ নেই। ভয়াল দর্শন একটা বাঘ। মুখ অল্প হা করা মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। স্থির চোখে মোতালেব সাহেবের দিকে তাকিয়ে পিছনে দীর্ঘ লেজটা অল্প অল্প নড়ছে। তবে ভঙ্গিটা লাফ দেয়ার, এখনই লাফ দিবে... আর ঠিক তখনই বাঘটা লাফ দিল, ঠিক তার উপর পড়ল না তাকে টপকে তার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বেশ দূরে ক্রাশ ল্যান্ড করল! তিনি একটু অবাক হলেন। আর ঠিক তখনই তিনি একটি মনুষ্য গলার আওয়াজ পেলেন।

ব্যাড ভেরি ব্যাড... হয় নি এবারও হয় নি। তিনি ঘুরে দেখেন বাঘটা যেখানে আছড়ে পড়েছে সেখানে লম্বা প্যাঁচানো চাবুক হাতে শুশ্রুমণ্ডিত একটা লোক দাঁড়িয়ে। তার গায়ে ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়। লোকটি এবার হাসি মুখে এগিয়ে এল মোতালেব সাহেবের দিকে। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—

আমি ডঃ সাইফুল কিবরিয়া। আপনি?

আমি মোতালেব। মোতালেব চৌধুরী। কিন্তু আপনি এখানে কেন?

আমার ডেরায় চলুন সব খুলে বলব। আপনি নিশ্চয়ই বাঘের কামড়ে আত্ম-হুতি দিতে এসেছিলেন?

হ্যাঁ আপনি কী করে বুঝলেন?

আমিও আপনার মতোই এসেছিলাম সেম স্টোরি সেম প্লেস... চলুন চলুন।

আজ থেকে বছর পাঁচকে আগে মোতালেব সাহেবের মতোই আত্মহুতি দিতে এসেছিলেন ড. সাইফুল কিবরিয়া এই জঙ্গলে। বাঘ তার দিকে লাফও দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক তার উপর দিয়ে গিয়ে পড়ল ত্রিশ গজ দূরে। ড. সাইফুল আশ্চর্য হলেন। ব্যাপারটা কী টার্গেট মিস করল কেন বাঘ! তারপর তিনি অচিরেই আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলেন প্রতিটা বাঘই শিকার ধরার জন্য লাফ দিচ্ছে কিন্তু জায়গামতো পড়ছেনা মেজারমেন্টে ভুল হচ্ছে। জায়গামতো পড়ছে না, হয় আগে আছড়ে পড়ছে নয় শিকার টপকে দূরে গিয়ে পড়ছে।

কেন এমনটা হচ্ছে? প্রশ্ন না করে পারলেন না মোতালেব সাহেব।

সত্যি কথা বলতে কী এর মূল কারণ গ্রীনহাউজ এফেক্ট। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে কেন?

পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে বলে এন্টারটিকার বরফ গলছে তাপে।

আরে নারে ভাই তা নয়। আসল কারণ হচ্ছে গ্রীনহাউজ এফেক্টের কারণে তাপে সমুদ্রের পানি আয়তনে বেড়ে যাচ্ছে...

তার সঙ্গে বাঘের লাফের হেরফেরের সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক অবশ্যই আছে, পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে তার নানারকম এফেক্ট পড়ছে প্রানীদের জ্বীনের উপর... মানব সমাজে হঠাৎ করে এত ওটিস্টিক বেবী হচ্ছে কেন? সবই জ্বীনের খেলা!

... তো যাহোক জ্বীনের কথা বাদ দিয়ে ড. সাইফুলের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। তিনি আত্মহত্যার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে বাঘদের নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। তিনি অচিরেই আবিষ্কার করলেন সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কমে যাচ্ছে আর হরিণের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে-এর কারণ আর কিছুই না। বাঘের বেসাইজ লাফ। ঠিকমতো শিকার ধরতে পারছে না, ফলে না খেয়ে মরছে। ওদিকে বাঘের হাতে মরতে হচ্ছে না বলে হরিণের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তখন তিনি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে একটা স্কুল খুললেন 'টাইগারস্ জাম্পিং ক্লাব' এখানে তিনি বাঘদের টার্গেটে লাফ দেয়া প্র্যাকটিস করাতে শুরু করলেন।

বলেন কী বাঘ আপনার কথা শুনলো?

না শুনে উপায় আছে? ওদের বাঁচতে হবে না। এই যে ধরুন আপনার উপর লাফ দিল যে বাঘটা, সে তো আমার পাশ করা স্টুডেন্ট। সাকসেস্ফুলি দু-দুটো হরিণকে লাফ দিয়ে মারতে পেরেছে। আমি ভেবেছিলাম আপনাকেও পেড়ে ফেলবে কিন্তু টার্গেট মিস করল। তাই ওকে ফেল করিয়ে দিলাম আবার শুরু থেকে কোর্স করতে হবে ওর। হঠাৎ তিনি হাতের চাবুকটা শূন্যে ঘুরিয়ে চেচিয়ে উঠলেন–"হ্যাট হ্যাট..." মোতালেব সাহেব দেখলেন সেই বিশাল বাঘটা কেমন মাথা নিচু করে পিছিয়ে গেল। দূরে আরো বেশ কয়েকটা ছোট বাঘ লাফ দিচ্ছিল একা একাই।

ড. সাইফুল কিবরিয়ার 'টাইগারস্ জাম্পিং ক্লাবে' অবশেষে মোতালেব সাহেবের একটা চাকরি হয়ে গেল। এসিসটেন্ট জাম্পিং ট্রেনার। অবৈতনিক চাকরি। তা হোক। দেশের গর্ব রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের জন্য একটা কিছু করতে পারা সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। মোতালেব সাহেব প্রতিদিন ভোরে উঠে চাবুক হাতে বাঘদের তাড়া করে একটা খোলা জায়গায় নিয়ে যান তারপর এক এক করে তাদের লাফ প্র্যাকটিস করান। পদ্ধতিটা অবশ্য ড. সাইফুল কিবরিয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। কীভাবে ওদের লাফ দেয়াতে হবে। কাজটায় তিনি বেশ

আনন্দ পেতে শুরু করলেন। আত্মহত্যার পরিকল্পনা বাদ দিলেন। দেশের জন্য সত্যি সত্যি একটা কিছু করতে পারছেন। এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। 'টাইগারস জাম্পিং ক্লাবে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে। মানে বাঘ বাড়তে থাকে কারণ বাঘরাও বুঝতে পেরেছে বিচিত্র কারনে তাদের এখন ল্যাজে গোবরে অবস্থা... মানে টার্গেটমতো জাম্প করতে পারছে না তারা। আর জায়গামতো জাম্প করতে না পারলে না খেয়ে মরতে হবে। তারা দলে দলে ট্রেনিং নিতে আসছে আর পাস করে বের হয়ে যাচ্ছে কৃতিত্বের সাথে।

মোতালের সাহেবও শিখে গেছেন বাঘদের কীভাবে লাফ দেওয়াতে হয়। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে রাত-দিন তাদের লাফ দেয়া শেখান মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।

তারপর একদিন ডক্টর সাইফুল ঘোষণা দিলেন। 'চলুন এবার ফেরা যাক।'

মানে?

মানে আমাদের কাজ শেষ। গতকাল সর্বশেষ বাঘটি পাশ করে গেছে। ওরা এখন লাফে এতটাই এক্সপার্ট হয়েছে যে, যে কোনো সময় নির্ভূলভাবে আমাদের দুজনের উপর লাফ দিয়ে ঘাড় মটকে খাবে!

কী বলছেন, ওরা আমাদের স্টুডেন্ট।

আরে কী বলেন ভাই বাঘতো বাঘই, খিদে লাগলে ছাত্র শিক্ষক কোনো বিষয় না, চলুন। ঢাকায় ফিরে যাই ওখানে গিয়ে এবার মানুষদের লাফ দেয়া শেখাব।

মানে?

মানে মানুষরাও কিন্তু আজকাল কেউ জায়গামত লাফ দিয়ে ল্যান্ড করতে পারে না। মানে তাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পার না। হয় জেলখানায় ঢুকে নয়তো... চলেন তাদের ট্রেনিং দেই। বাঘদের যখন আমরা পেরেছি মানুষদেরও পারব।

ঢাকায় পৌঁছে নিজের বাসায় ঢুকতেই দেখেন তার প্রিয়তম স্ত্রী হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দুই চোখের নিচে কালি চুল আলুথালু... হাত থেকে কাপটা পরে চুর্মার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে, তারপর অনেকটা বাঘিনির মতো ঝাঁপ দিলেন মতলুব সাহেবের দিকে। মতলুব সাহেবের কানে একটা কথাই ঢুকল 'এতদিন কোথায় ছিলে...?' টাল সামলাতে না পেরে আছড়ে পড়লেন তিনি। আছড়ে পড়াতে এত সুখ আগে কখনো বুঝেন নি। তবে ঐ অবস্থায় থেকে তিনি অন্তত একটা জিনিস বুঝলেন, মানুষকে আর যাই হোক লাফ দেয়া শেখাতে হবে না।

ভাগ বাটোয়ারা সমান হবে সমানে সমান

এক সিংহ, এক হায়েনা আর এক শিয়াল একসাথে শিকারে বের হয়েছে প্রচুর শিকার করল তারা। তারপর দিনের শেষে তারা শিকার ভাগ করতে বসল। সিংহ বলল–

–হায়েনা। ভাগ বাটোয়ারাটা তুমিই কর।

হায়েনা খুব যত্ন সহকারে মৃত পশুগুলোকে তিন ভাগ করল। হায়েনার ভাগ করা দেখে সিংহ এক থাবায় হায়েনার ঘাড় মটকে দিল। তারপর বলল–

–শেয়াল, হায়েনার ভাগ করা আমার পছন্দ হয়নি। বরং তুমি ভাগ কর দেখি।

– জী জনাব। বিনীতভাবে বলল শেয়াল।

তারপর ভাগ করতে বসল। তবে খুব দ্রুতই ভাগ করা হয়ে গেল। সিংহ অবাক হলো। দেখে, শেয়াল নিজের জন্য একটা মৃত ছোট্ট পাখি রেখে বাকিগুলো সব সিংহের জন্য রেখে দিয়েছে। সিংহ মুচকি হাসল। তারপর বলল—

–ওহে শেয়াল তুমিতো চমৎকার ভাগ করেছ। তা এত চমৎকার ভাগ করা শিখলে কোথায়?

–হায়েনার কাছে।

উত্তরটা মৃত হায়েনার দিকে তাকিয়েই দিল শেয়াল।

পৃথিবীর সব গ্যাঞ্জাম কিন্তু এই ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েই। ভাগ বাটোয়ারা যে শেয়ালের বিচক্ষণতা নিয়ে করবে সে-ই টিকে থাকবে নইলে হায়েনার মতো 'ইন্নালিল্লাহে... 'বলে রওনা দিতে হবে স্বর্গের দিকে (অবশ্য প্রানীদের জন্য যদি স্বর্গ থেকে থাকে)।

ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে আরেকটা সহজ-সরল গল্প আছে। দুই বন্ধু মিলে মাছ ধরেছে সারাদিন ধরে। একটা বিশাল বোয়াল মাছ আর একটা ছোট সাইজ বাইন মাছ। এখন দিনের শেষে মাছ ভাগ করতে বসেছে দু'জন। ধুরন্ধর বন্ধু বলল–

–শোন, হয় বোয়াল মাছটা আমাকে দাও আর বাইন মাছটা তুমি রাখ, নইলে...

–নইলে? কিঞ্চিৎ বেকুর বন্ধু জানতে চায়।

–নইলে বাইন মাছটা তুমি রেখে বোয়াল মাছটা আমাকে দাও!

শেষপর্যন্ত কোন বন্ধু কোন মাছ নিয়েছিল জানা যায়নি। তবে ভাগাভাগির শেষ একটা ঘটনা দিয়ে শেষ করি। খুব সুস্বাদু কেকের দুটো টুকরো দেয়া হয়েছে দু'ভাইকে। ছোট ভাই টপ করে বড় টুকরোটা মুখে পুড়ে ফেলল। বড়ভাই বলল- 'ভদ্রতাও শিখিসনি।'

–কেন? কী হয়েছে? তুমি হলে কী করতে?

–ছোট টুকরোটা নিতাম।

–সেটাইতো নিয়েছ তুমি, অসুবিধা কোথায়?

ভাগ বাটোয়ারা বা ভাগাভাগির ব্যাপারটা এবার বাসের ভেতর নিলে কেমন হয়? বাসের ভেতর বেশ ভিড়। একটা সিট খালি হতেই হুড়োহুড়ি করে বসল একজন। একজন বয়স্ক লোক বললেন–

–দেখুন, আমাদের আরও সহনশীল, ভদ্র মার্জিত হতে হবে। পনেরকোটি মানুষ ভাগ-বাটোয়ারা করেই চলতে হবে, একটা সিটে কষ্ট করে দু'জন বসতে হবে...

বৃদ্ধের কথায় সবাই সায় দিল। 'ঠিক ঠিক মুরুব্বী' আপনি ঠিক বলেছেন... আমাদের আরও ভদ্র আচরণ করতে হবে... অন্যদের বসার সুযোগ করে দিতে হবে।' এই সময় এক লোক, যে তার পুত্রকে কোলে নিয়ে বসেছিল। পাশেই দাঁড়িয়েছিল এক সুন্দরী তরুণী। সেই লোক হঠাৎ তার কোলে বসা পুত্রকে ধমক দিল 'ভদ্রতা শেখনি, ওই ভদ্র মহিলা কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি উঠে তোমার সিটে ওনাকে বসতে দাও!'

সবশেষে সেই যাত্রাপালার ঘটনার সূত্র ধরে বলতে হয়, 'ভাগ বাটোয়ারা কেমন হবে এবার বল দেখি?'

'ভাগ-বাটোয়ারা সমান হবে।

সমানে সমান!'

ডাল ভাত বনাম শাক ভাত

ঢাকা শহরের এক ফ্ল্যাটবাড়ি। স্বামী এসেছে খেতে। স্ত্রী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'ওগো খেতে বস বেশি কিছু রাঁধতে পারিনি। পোলাও, রেজালা, বড় চিংড়ির কালিয়া আর ছানার পায়েশ...' শুনে স্বামী হতভম্ব! বলে কি? স্বামী বলল–

–কি সব বলছ? বাজারে চালের কেজি চল্লিশ টাকার উপরে। তুমি পোলাও রাঁধলে কীভাবে? আর আমি এতসব বাজার করলাম কখন? স্ত্রী মুখে আঙুল দিয়ে শশশ... করে উঠল তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'টেবিলে কচুর ভর্তা আর লাল চালের ভাত দেয়া আছে কেউ এসে পড়ার আগে খেয়ে নাও জলদি জলদি।'

–বাহ্ তাহলে এসব বললে কেন? স্ত্রী আগের মতোই ফিসফিস করে বলল–

–বাহ্ পাশের ফ্ল্যাটের ওদের শোনাতে হবে না?

ওদিকে পাশের ফ্ল্যাটেও একই কাহিনী। বরং পাশের ফ্ল্যাটেই ঢোকা যাক।

ফ্ল্যাটবাড়ি। স্বামী এসেছে খেতে। স্ত্রী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'ওগো খেতে বস বেশি কিছু রাঁধতে পারিনি। বিরিয়ানি, কোপ্তা, গলদা চিংড়ির ঝোল আর পুডিং...' শুনে এই স্বামীও হতভম্ভ! বলে কি? স্বামী বলল–

–কি সব বলছ? বাজারে চালের কেজি চল্লিশ টাকার উপরে। তুমি এতসব রাঁধলে কীভাবে? আর আমি এতসব বাজার করলামইবা কখন? স্ত্রী মুখে আঙুল দিয়ে শশশ... করে উঠল তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'টেবিলে আলুর ভর্তা, ডাল আর ভাত দেয়া আছে চুপে চাপে খেয়ে নাও জলদি...।'

আসলে দেশের যে অবস্থা এখন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর 'ডাল ভাতই' যেন রাষ্ট্রীয় মেন্যু হতে চলেছে। বরং ডালভাতের একটা গল্প শোনা যাক। দুই বন্ধু, এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে দাওয়াত করল–

–দোস্ত কাল আমার বাসায় চারটা ডাল ভাত খাবি।

–এ সময় কেন এসব ঝামেলা করছিস?

–আরে ডাল ভাতইতো খাবি...

দাওয়াতি বন্ধু খেতে গিয়ে দেখে টেবিলে সত্যি সত্যি 'ডাল ভাত', আর কিছু নেই। ভেতরে ভেতরে মেজাজ খারাপ হলো বন্ধুর। সে ঠিক করল শালার বেটাকে শিক্ষা দিতে হবে (সেই শেয়াল আর বক কাহিনী আর কি!)। দু'দিন পর সে তাকে দাওয়াত করল।

–দোস্ত কাল আমার বাসায় চারটা শাক ভাত খাবি।

–এ সময় কেন এসব ঝামেলা করছিস?

–আরে শাক ভাতইতো খাবি...

দাওয়াতি বন্ধু খেতে গিয়ে দেখে টেবিলে সত্যি সত্যি 'শাক ভাত', আর কিছু নেই। কিন্তু শাক উল্টে দেখে মাছ!

–একি তুইতো দেখছি শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রেখেছিস?

–হ্যাঁ ভাজা মাছ। গম্ভীর হয়ে বলল বন্ধু!

–আমি কিন্তু ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানি।

– খা তাহলে।

দাওয়াতি বন্ধু শেষপর্যন্ত ভাজা মাছ উল্টে খেয়েছিল কি না জানা যায়নি। তবে মাছটি যদি হয়ে থাকে গভীর সমুদ্রের ড্রাগন ফিশ তাহলে খেতে পারেনি সে। কারণ চায়নিজ কুসংস্কার আছে ড্রাগন মাছ যেদিন উল্টাবে সেদিন পৃথিবীও উল্টে যাবে।

সব শেষে মাছ বিষয়ক একটু জ্ঞান দেয়া যাক। শার্ক এমন একটা মাছ যে কখনও থামে না সবসময় দৌড়ের উপর থাকে। কারণ সে থামলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। অতএব 'থামলে ভাল লাগে' এই বাক্য মানুষের জন্য প্রযোজ্য হলেও হাঙ্গরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

রসকষহীন রস

'রস' শব্দটার মধ্যে আসলে কোনো রস-কষ নেই। বরং ফলমূলের সঙ্গে এ শব্দটা যায়। 'আনারসটা বেশ রসাল' বা 'রসে টইটম্বুর তরমুজ'–এ জাতীয় বাক্যের সঙ্গে রস চলতে পারে। মানে বেশ ভালোই শোনায়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ... ' লোকটা রসিক' বা ' লোকটা রসিকতা বোঝে' এও চলে... মানে এখানে রস বেশ ম্যাচ করে যায়! এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে–

এক সম্পাদক। রসিক সম্পাদকই বলা যায় তাঁকে। কারণ, তাঁর পত্রিকায় শুধু হাসির গল্পই ছাপা হয়। তো একবার এক জাঁদরেল লেখক তাঁর পত্রিকায় নিয়মিত হাসির গল্প লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু পাঠক বেরসিক! তাঁর লেখা খাচ্ছে না। মানে গল্পের রসে টইটম্বুর হচ্ছে না। তখন বর্ষীয়ান সম্পাদক জাঁদরেল রম্যলেখককে একদিন ডেকে পাঠালেন।

–দেখুন, আপনার গল্প তো হাসির হচ্ছে না।

–হচ্ছে না!–লেখক অবাক।

–মোটেই না।

–তাহলে কি আরেকটু রস ঢোকাব?

–রস ঢোকাবেন মানে? রস ইনজেক্ট করে ঢোকানো যায় নাকি? আপনি বরং এক কাজ করেন...

–কী কাজ?

–লেখা বন্ধ করেন।

–কী বলছেন, আমার পরের গল্পগুলো তো অনেক বেশি রসাল।

–পরের গল্পগুলো থেকে কিছু রস নিংড়ে নিয়ে প্রবন্ধ হিসেবে অন্য পত্রিকায় দিন, প্লিজ...। আমার দরকার নেই।

নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র খুবই বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। কবি-সাহিত্যিকদের সব সময় উৎসাহ দিতেন। তাঁর অনুরোধে কবি ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি রচনা করেন। ভারতচন্দ্র একদিন রাজসভায় উপস্থিত হলেন।

কাব্যটি নিয়ে সবাই বিদ্যাসুন্দর-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। 'অত্যন্ত রসোত্তীর্ণ হয়েছে', 'যাকে বলে রসে টইটম্বুর' নানা মন্তব্যে মহারাজা খুশি হলেন। হাসিমুকে বইটি একনজর দেখে পাশে কাত করে রাখলেন। ভারতচন্দ্র হাহা করে উঠলেন–

– ও কী করছেন মহারাজ?

–কেন কী হয়েছে?

–রস সব গড়িয়ে পড়বে যে!-দরবারের সবাই এবার হেসে উঠলেন একসঙ্গে।

রসের ইংরেজি কী হবে? উইটি না হিউমার? আমার মনে হয়, রসের সঙ্গে যেহেতু গড়িয়ে পড়ার একটা ব্যাপার আছে, কাজেই হিউমার হওয়াই উচিত। সে ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সমস্যা আছে, মানব চোখের যে অংশটা থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার নাম 'অ্যাকোয়াস হিউমার'।... সেলুকাস! কী বিচিত্র এই মানববিজ্ঞান! অশ্রু গড়িয়ে পড়ে হিউমার থেকে! তবে এটাও সত্যি, মানুষ যখন প্রচণ্ড হাসে তখন তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে (কে জানে সে কারণেই অ্যাকোয়াস হিউমার কি না) কিংবা কে জানে, এটাকেই বোধ হয় বলে 'আনন্দাশ্রু'। আনন্দাশ্রু পর্যন্ত যেহেতু এলাম কুম্ভীরাশ্রুই বাদ যাবে কেন? কুমির যখন প্রকাণ্ড হাঁ করে কোনো প্রাণীকে গিলে খায়, তখন তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সবাই ভাবে আহা বেচারী প্রাণীটাকে গিলে খাচ্ছে বলেই দুঃখে কুমির কাঁদছে। কুম্ভীরাশ্রু ঝরছে। ব্যাপারটা নাকি আসলে তা নয়। আসল কারণ, কুমির যখন হাঁ করে তখন তার চোখের ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে চাপ পড়ে, সেখান থেকে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সব কথার শেষ কথা হচ্ছে, কুম্ভীরাশ্রু নয়, আমাদের আনন্দাশ্রু দরকার। সেই জন্য চাই রস... রসকষহীন রস নয়, নির্ভেজাল রস।

হায় বিধি বাম!

একটা ক্রুড জোকস দিয়ে শুরু ...

এক লোকের বাচ্চা অসুস্থ। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করল। কিন্তু বাচ্চাকে বাঁচানো গেল না। মারা গেল বাচ্চা। বাচ্চার বাবা ভয়ঙ্কর রেগে গেল। চিৎকার করে বলল, আমি আমার বাচ্চা ফেরত চাই যে কোনও মূল্যে। ডাক্তার বলল, জনাব আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি... পারিনি। আমাকে যে শাস্তি দিবেন মাথা পেতে নিব। দরকার মনে করলে আমার বাচ্চাকে নিয়ে যান।

ক্ষিপ্ত বাব তাই করল, ডাক্তারের বাচ্ছাকে নিয়ে গেল। বছরখানেক পর সেই লোক তার কাজের বুয়াকে নিয়ে এল। ভয়ানক অসুস্থ বুয়া।

ডাক্তার জান বাজি রেখে চেষ্টা করল। কিন্তু হায় বিধি বাম! বুয়া মারা গেল। সেই লোক ফিউরিয়াস হয়ে গেল। 'যে কোনও মূল্যে আমার বুয়াকে চাই... নইলে'–ডাক্তার আগের মতোই করজোরে বলল-'জনাব আমি শেষপর্যন্ত চেষ্টা করেছি... পারিনি। আমাকে যে শাস্তি দিবেন মাথা পেতে নিব। দরকার মনে করলে আমার বাসার বুয়াকে নিয়ে যান। তার বেতন আমি দিব চিন্তা করবেন না...তবু নিয়ে যান।'

লোকটি ডাক্তারের বুয়াকে নিয়ে গেল।

বছরখানেক পর সেই লোকটি একদিন সেই ডাক্তারের বাসায় গিয়ে হাজির। ডাক্তার তখন চেম্বারে। দরজা খুলল ডাক্তারের সুন্দরী স্ত্রী।

-কি চাই?

-না মানে আপনাকে দেখতে এলাম একটু

-কেন?... ও মনে পড়েছে আপনি সেই লোক না, যে আমার বাচ্চা, বুয়াকে নিয়ে গেছেন?

-হ্যাঁ আমিই সেই লোক। আচ্ছা আসি। লোকটি হন হন করে চলে গেল।

কিছুদিন পর লোকটি তার স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে হাজির। স্ত্রী ভয়ানক অসুস্থ।

গল্পটা এখানেই শেষ। কিন্তু ছোট গল্পের সেই ফর্মুলায় পড়ে শেষ হইয়াও যেন হইল না শেষ। ডাক্তার এ যাত্রায় চিকিৎসা করে স্ত্রীকে ভাল করে তুলল।

-সেকি! লোক তো অবাক 'এ হতে পারে না'

-কী হতে পারে না?

-আপনি ভুল চিকিৎসা করেছেন।

-কী বলছেন। মানুষ বাঁচানোই আমার কাজ। মাঝে মধ্যে ভুল হতেই পারে, তাই বলে... যখন মানুষ বাঁচালাম তখন আপনি বলছেন ভুল চিকিৎসা করেছি? ছি ছি...

তারপরের ঘটনা কি ঘটেছিল আর জানা যায়নি।

এক দার্শনিক বলেছিলেন। 'মানুষের বেঁচে থাকাটাই নাকি একট চরম ভুল.। তারপরও মানুষ বেঁচে থাকে। ভুলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য'।

এক ভুলোমন বিখ্যাত প্রফেসরের ভুল দিয়ে শেষ করি।

একদিন সেই প্রফেসর ভুল করে নিজের বাসায় না গিয়ে প্রতিবেশীর বাসায় গিয়ে সোজা বেডরুমে গিয়ে প্রতিবেশীর স্ত্রীর পাশে শুয়ে পড়লেন ক্লান্ত হয়ে। 'ওগো জলদি এক কাপ কফি দাও।' প্রতিবেশীর স্ত্রী বললেন, 'দেখুন আপনি ভুল করছেন এটা আপনার বাসা নয়। আর আমিও আপনার স্ত্রী নই'। তখন প্রফেসর চেঁচিয়ে বললেন ' দেখন আমি এক ভুল কখনো তিনবার করি না। গত দুই দিন ভুল বাসায় ঢুকেছিলাম স্বীকার করছি। কিন্তু আজ অবশ্যই সঠিক বাসায় ঢুকেছি!

এরপর অবশ্য প্রতিবেশীর স্ত্রী সেই ভুলোমন প্রফেসরের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন জানা যায়নি।

কয়েক সেকেন্ডের বড় বিপদ!

জ্যাতিষের কাছে গেছে এক লোক নিজের ভাগ্য ও বিপদ-আপদ সম্পর্কে জানতে।

-ভাই গ্রহ-নক্ষত্র দেখে বলে দিন সামনে কোনও বড় বিপদ আছে কি না।

–আছে, খুব বড় বিপদ!

–হায় হায় বলেন কি? তো বড় বিপদটা কতক্ষণ থাকবে?

–বেশিক্ষণ না মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

–ওহ্ তাও ভাল। বড় বিপদ যত কম সময় থাকে!

লোকটি খুশি মনে জ্যোতিষীকে তার ফি দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ানো মাত্র এক বাস তাকে চাপা দিয়ে চলে গেল।

জ্যোতিষীর কথাই ঠিক। বড় বিপদ কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ড! তারপরও লোকটার (মানে মৃত লোকটার) কপাল ভাল বলতে হবে। কারণ তার জীবন বীমা করা ছিল, তৎক্ষণাৎ বিশ লাখ টাকা পেয়ে গেল। সে পেল না, পেল তার স্ত্রী। স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল ছিল না। স্ত্রী কয়েকদিন হাউমাউ খাউ কাঁদল, তারপর বীমার বিশ লাখ টাকা হাতে নিয়ে তার প্রাক্তন প্রেমিককে ফোন দিল।

–হ্যালো চল এবার আমরা বিয়ে করি।

–কিন্তু।

–আবার কিন্তু কি?

–মানে জ্যোতিষ বলল এ বছর বিয়ে করলে ...

–এ বছর বিয়ে করলে...? তারপর থামলে কেন??

প্রেমিক বলতে থাকুক জ্যোতিষ কি বলেছে, আমরা এই ফাঁকে ওই লোকের কি হলো দেখি।

ওই মৃত লোক চলল স্বর্গ নরকের দিকে। পথে মানে স্বর্গ-নরকে নো ম্যান্স জোনে তাকে আটকানো হলো।

–থামো।

–কেন?

–স্বর্গ-নরকে যাওয়ার আগে তোমার ভাগ্য গণনা করতে হবে।

–কি বলছেন? এসবতো পৃথিবীর কর্মকাণ্ড।

–আরে নারে ভাই এখন এখানেও এসব চালু হয়েছে। মানুষ এমন কায়দা করে আজকাল পাপপুণ্য করছে যে ধরা যাচ্ছে না। তাই শেষমেশ পৃথিবী থেকেই একজন জ্যোতিষী ধরে আনা হয়েছে। সেই-ই নির্ধারণ করবে কে স্বর্গে যাবে কে নরকে।

–কি বলছেন এসব?!

–ঠিকই বলছি যান আপনি, ওখানে যান, ওখানে একজন জ্যোতিষী বসে আছে...

ওই লোক গিয়ে দেখে সেই জ্যোতিষ, যে পৃথিবীতে তাকে বলেছিল-কয়েক সেকেন্ডের জন্য বড় বিপদ হবে, তারপরই সে মারা যায়!

–আপনি?

–হ্যাঁ আমি। আপনি কি করে এখানে এলেন??

–ভাইরে বলা নাই কওয়া নাই হঠাৎ দিনে-দুপুরে ঠাডা পইড়া মইরা গেলাম। তারপরে এইখানে...

ওদিকে লোকটির জীবিত স্ত্রী তখন তার প্রেমিককে প্রশ্ন করে চলেছে–

–থামলে কেন? কি বলল জ্যোতিষ? এবছর বিয়ে করলে...?

–কি আশ্চর্য? লাকটা এই মাত্র ঠাডা পড়ে মারা গেল। যাকে বলে বিনা মেঘে বজ্রপাত!!

–কে জ্যোতিষী?

–হ্যাঁ।

আবার ফিরে আসি লোকটার কাছে। লোকটি জ্যোতিষকে বলল-

– ভাই কিছু যদি মনে না করেন একটা প্রশ্ন করতে পারি?

– পারেন। কি প্রশ্ন?

–এই যে ঠাডা পড়ে মারা গেলেন আপনি। আপনার গ্রহ নক্ষত্র বিচার বিশ্লেষণ করে আগে বুঝতে পারেননি?

–নারে ভাই।

–কেন? আপনি কি জ্যোতিষ চর্চার কিছুই জানেন না?

–না।

–মানে?

–আরে ভাই জ্যোতিষ চর্চার জন্য লেখাপড়া জানা চাই।

–আপনি লেখাপড়া জানেন না?

–ভাইরে লেখাপড়া জানলে কি আর এই লাইনে আসি?

আদিম প্রেমিক!

ভালবাসা প্রাচীনকালে কেমন ছিল? মানে সেই আদিম কালে। মানুষ যখন গুহায় বাস করত?

তখন কেমন ছিল প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক? কল্পনা করতে দোষ কি? এক গুহাবাসী তরুণী ছুটে এল তার প্রেমিকের কাছে—

—শুনেছ? সর্বনাশ হয়েছে।

—কি হয়েছে?

—আমার মার গুহায় একটা হিংস্র ম্যামথ ঢুকে পড়েছে।

—তাতে সমস্যা কি?

—তুমি আমার প্রেমিক কিছু একটা কর।

—ম্যামথ হাতির কি ক্ষতি হলো তাতে আমার কিছুই যায়-আসে না!

আদিম প্রেমিকের নির্বিকার উত্তর।

এবার আসা যাক আধুনিক যুগে।

ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে প্রেমিক-প্রেমিকা সারাদিন ডেট করে ঢুকল একটা দামি রেস্টুরেন্টে খেতে। খাওয়া-দাওয়া শেষে প্রেমিক হায় হায় করে উঠল।

—কী হলো? জানতে চায় প্রেমিকা।

—আমার মানিব্যাগ খোয়া গেছে।

—জানতাম এমনটা হবে। তাই আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। সব ছেলেরাই এমনটা করে যুগ যুগ ধরে...।

অপ্রস্তুত প্রেমিকের সামনে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে প্রেমিকা গম্ভীর মুখে বিল মিটাল। তারপর তারা রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে এল। প্রেমিক প্রেমিকাকে তার বাসায় পৌঁছে দিল। পথে কোনও কথা হলো না। বিদায় নেয়ার মুহূর্তে প্রেমিকা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে বাড়িয়ে দিল প্রেমিকের খোয়া যাওয়া শূন্য মানিব্যাগটি!

সবশেষে ভালবাসার সেই ক্লাসিক গল্পটি শোনা যাক...।

—তুমি আমার ভালবাসা পেতে পার একটা কাজ যদি কর। সুন্দরী প্রেমিকা বলে।

–কী কাজ?

–তোমার মাকে হত্যা করে তার হৃদপিণ্ডটি এনে দিতে হবে। পারবে?

–পারব। দ্বিধান্বিত গলায় বলে ব্যাকুল প্রেমিক।

–বেশ তাহলে নিয়ে এস। উদভ্রান্ত প্রেমিক ছুটল মায়ের কাছে। মাকে হত্যা করল। তার বুকের পাজর ছিঁড়ে বের করল তাজা হৃদপিণ্ড।

তখনও ধুকধুক করছে হৃদপিণ্ডটি। প্রেমিক উদভ্রান্তের মতো ছুটল প্রেমিকার কাছে। বন্ধুর পথ! পথে হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রেমিক। হাত থেকে ছিটকে পড়ল তার মায়ের হৃদপিণ্ডটি।

হৃদপিণ্ডটি তুলে নিতে যাবে এ সময় কথা বলে উঠল মায়ের হৃদয়...

"বাছা ব্যথা পেয়েছ?"

এবার পাঠকরাই বিচার করবেন প্রকৃত ভালবাসা কার? তবে প্রকৃত ভালবাসা আসলে প্রকৃতির, কারণ এখনও আত্মধ্বংসী মানব জাতিকে আগলে রেখেছে ... সেই প্রকৃতিইতো!!

সংসার ত্যাগি সন্নাসী

নতুন বছরে মানে ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসের কোনও এক সকালে বা বিকালে হঠাৎ করে রাস্তায় দুই বাল্য বন্ধুর দেখা–

–কিরে খবর কি?

–এইতো আছি আরকি।

–আছিস মানে... নতুন বছরে কেমন আছিস?

–নারে ভাল না, ঠিক করেছি বাড়ি গাড়ি সংসার সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাব হিমালয়ের চূড়ায়, এ জীবন আর ভাল লাগছে না।

–দারুণ আইডিয়া, আমারও একই প্লান। এই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগছে না। তা কবে যাবি?

–এইতো... খুব শিগ্রী

–সেই খুব শিগ্রীটা কবে?

–আরে আগে বাড়ি গাড়ি সংসার হোক তারপর না ওসব ছেড়ে... ছুঁড়ে সন্ন্যাসী হব।

সন্ন্যাসীদের প্রসঙ্গ এলে মজা করেই হোক বা সিরিয়াসলিই হোক সবাই হিমালয় যাওয়ার পরিকল্পনা করে। হিমালয়ের কোনও দুর্গম গুহায়। কিন্তু কেন? আবার দুই বন্ধুর সাহায্য নেয়া যাক। তারাও সন্ন্যাসী হবার পরিকল্পনা করছে–

–কিরে দোস, খবর কি?

–এইতো আছি আরকি

–আছিস মানে ... নতুন বছরে কেমন আছিস?

–নারে ভাল না, ঠিক করেছি বাড়ি গাড়ি সংসার সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাব হিমালয়ের চূড়ায়, এ জীবন আর ভাল লাগছে না।

–দারুণ আইডিয়া, আমারও একই প্লান। এই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগছে না। তবে একটা কথা।

–কি?

–হিমালয়ের চূড়ায় কেন?

–আরে তাও বুঝলি না, হিমালয় হচ্ছে সবচে উঁচু পর্বত যত উপরে উঠবি ঈশ্বরের তত কাছাকাছি।

–কিন্তু ওখানেতো বড্ড ঠাণ্ডারে। নিউমোনিয়ায় মরতে হবে।

–সেটাইতো চাই, মরলেই সোজা ঈশ্বরের কাছে। ধ্যান পর্যন্ত করতে হবে না। খাটনি কম। তবে সৌখিন সন্ন্যাসীদের জন্য সুখবর আছে। বাংলাদেশের বান্দরবানে রংছড়ি উপজেলায় আরও উঁচু কিও ক্রেডাং বা তাজিনডং থেকেও উঁচু পর্বতের সন্ধান পাওয়া গেছে সম্প্রতি। নাম হচ্ছে–'শিপ্পি'। নিউমোনিয়া বাঁধাতে আর হিমালয় যেতে হবে না। শিপ্পি গেলেই চলবে।

সব শেষে আসল এক সাধুর সন্ধানে যাওয়া যাক। যে সারা জীবন দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে অবশেষে বিশাল এক আশ্রমে স্থিতু হয়ে ঈশ্বরের ধ্যান করে চলেছেন। এক সাংবাদিক গেল তার কাছে!

–সাধুজি সারাজীবনতো ঈশ্বরের খোঁজে ঘুরে বেড়ালেন।

–হু

–তা পেলেন কিছু?

– না পাইনি

–তাহলেতো আপনার জীবন ব্যর্থ

–নাহ ব্যর্থ কেন হবে? যার জন্য সাধু হয়েছিলাম তাকে খুঁজে পেয়েছি

– মানে?

– মানে আমার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় দিয়ে একজনের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসায় নেমেছিলাম। সে সব টাকা নিয়ে ভেগে গিয়েছিল। তারপরই রাগে দুঃখে হতাশায় সাধু হয়ে ঈশ্বরকে খুঁজতে থাকি কিন্তু ঈশ্বরকে খুঁজতে গিয়ে ঐ পার্টনারকে পেয়ে যাই।

–তারপর?

–তারপর আর কি! সে এখন জেলখানায় বসে ঈশ্বরের ধ্যান করে আর আমি এই আশ্রমে!

ক্ষুধা বনাম ডিনার

টিভির প্রতিটা চ্যানেল খুললেই দেখি দুর্দান্ত সব রেসিপি অনুষ্ঠান। কিভাবে ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক বানাতে হয় তা শেখাচ্ছেন সুন্দরী মহিলারা। কিংবা কিভাবে অরিজিনাল ইতালিয়ান পিৎজা বানাতে হয় সে প্রণালি শেখাচ্ছেন তারা... কিন্তু রাস্তায় বেরুলেই অন্য দৃশ্য, বিডিআর সপে বিশাল লম্বা লাইন স্রেফ মোটা চাল কেনার জন্য। মনে পড়ে সেই বিখ্যাত কোটেশনটি...'শহরের একদিকে ক্ষুধা আছে কিন্তু ডিনার নেই, আরেকদিকে ডিনার আছে কিন্তু ক্ষুধা নেই'। তো একবার হলো কি, শহরের এক প্রান্তের লোক গেল আরেক প্রান্তে।

– আপনাদের ডিনার আছে কিন্তু ক্ষুধা নেই।

– হ্যাঁ, তোমাদের ক্ষুধা আছে কিন্তু ডিনার নেই।

–ঠিক ধরেছেন, চলেন না কিছুদিনের জন্য আমরা জায়গা বদল করি। আপনারা আমাদের জায়গায়, আমরা আপনাদের জায়গায়।

–মন্দ না, একটা বেশ অ্যাডভেঞ্চার হবে।

ওদিকে খবর চলে গেল ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর সব শুনে চিন্তিত হলেন। 'এটা কী করে হয়?... আমাদের সিসটেম ক্রাশ করবে।'

–সিসটেমতো শুরু থেকেই ক্রাশ করে আছে। বলে এঞ্জেলরা।

–কী বলছ?

–মানুষ যখন থেকে স্বর্গচ্যুত হলো তখন থেকেই সিসটেম ক্রাশের শুরু। বরং এক কাজ করা যায়।

–কী কাজ?

–ওরা জায়গা বদল করুক তারপর আর ওদের যার যার জায়গায় ফিরিয়ে আনা হবে না।

–ওরা কি সেটা মানবে?

–ওদের মানা না মানা দিয়ে আমাদের কী যায় আসে?

–তা মন্দ বলনি। বেশ তাই হোক। গডের উইশ মানেই কমান্ড!

কিন্তু কিছুদিন পরই হাঁপিয়ে উঠল শহরের এক প্রান্ত মানে যে প্রান্তের ডিনার ছিল কিন্তু ক্ষুধা ছিল না। তারা একদিন এসে হাজির হলো।

–ওহে অনেক হয়েছে, তোমরা তোমাদের জায়গায় যাও।

–সম্ভব না।

–মানে?

–মানে আমরা সরব না, তোমাদের ভাল ভাল খাবার খেয়ে এখন আমাদের গায়ে অনেক শক্তি আর তোমরাতো আমাদের খাবার খেয়ে শরীরে যে হাল করেছ শক্তিতে পারবে না বরং ফিরে যাও, ওখানেই থাক। আরও অ্যাডভেঞ্চার কর।

–কী বলছ এসব তোমরা??

–ঠিকই বলছি। অনেক আরাম করেছ এবার অ্যাডভেঞ্চার কর!

বাধ্য হয়ে তারা ঈশ্বরের কাছে ফরিয়াদ করল। ঈশ্বর সব শুনলেন তারপর বললেন, ' দেখ দরিদ্রদের আমি বেশি ভালবাসি তাই তাদের এই দুনিয়ায় বেশি বেশি করে সৃষ্টি করি। তোমরা কি আমার ভালবাসা চাও না?"

–না আমাদের ভালবাসার দরকার নেই। আমাদের টাকা আছে টাকা দিয়ে ভালবাসা কিনতে পারি আমরা। শুধু নিজেদের শহরে ফিরে যেতে চাই।

–বেশ। গডের উইশ মানেই কমান্ড!

শহর ফের বদলে গেল। যে যার জায়গায়। শুধু ঈশ্বর ছোট্ট একটা খেলা খেললেন। দুই দলের মধ্যে দু'রকম ' বোধ' ঢুকিয়ে দিলেন। আছে দলে 'নাই বোধ' আর নাই দলে 'আছে বোধ'। কারণ ঈশ্বর জানেন 'যার নাই সে জানে তার নাই বলেই সব আছে, আর যার সব আছে, তার সব আছে বলেই কিছুই নেই।' (প্রিয় পাঠক শেষ বাক্যটি আসলে ঈশ্বরের নয় একজন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকের, সাধারণ মানুষের কাছে যিনি ছিলেন ঈশ্বরের মতোই। আর আমরাতো জানিই মানুষের ভেতরেই ঈশ্বরের পরবাস!)

গ্রহ নক্ষত্রের টক শো

আমরা আগেই জেনেছি। হাঙ্গর এমন একটি প্রাণী যে সবসময় দৌড়ের ওপর থাকে। মানে সবসময় সে গভীর সমুদ্রে সাঁতরে বেড়ায়। সে থামে না। তাকে কখনো থামতে দেখা যায় না। তাকে যদি শোনানো হয় কোনো বাংলা নাটকের বিখ্যাত ডায়লগ-'থামলে ভালো লাগে।' তাহলেও সে থামবে না। তো এই যখন অবস্থা তখন সমুদ্রের তলদেশে দাদি হাঙ্গর আর নাতি হাঙ্গর কথা বলছিল--

–আচ্ছা দাদি, আমরা সবসময় দৌড়াই কেন?

–কারণ আমরা থামতে পারি না।

–কেন থামলে কি হয়?

–থামলেই আমরা অসুস্থ হয়ে যাই।

–তাহলে আমাদের কোনোদিনই বিশ্রাম নেই?

–আছে।

–আছে?

–হ্যাঁ, আছে। ২০২৯ সালে আমাদের বিশ্রাম। আমাদের আর দৌড়াতে হবে না।

–কিন্তু ২০২৯ সাল পর্যন্ত কেন?

–কারণ হচ্ছে-'৯৯৯৪২ আপোফিস' ২০২৯ সালে পৃথিবীকে আঘাত হানবে এবং তখনই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। '৯৯৯৪২ আপোফিস' আসলে একটি অতিকায় গ্রহাণু যা ঠিক ২০২৯ সালে পৃথিবীকে আঘাত হানতে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা সেরকামটাই ধারণা করছেন। আর সে কারণেই এই হাঙ্গরকুলের বিশ্রামের দিন ধার্য হয়েছে ২০২৯ সাল। শুধু হাঙ্গর কেন এই পৃথিবীর সবার দৌড়ই তখন বন্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীর নিজের দৌড় তো বটেই।

আসলে সেদিন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে 'দ্যা এন্ড অব দ্যা আর্থ' নামে একটি অনুষ্ঠানে পৃথিবী ধ্বংসের প্রায় আটটি কারণ ব্যাখ্যা করলো। তার মধ্যে সবচেয়ে কাছের সময়টি হচ্ছে, ২০২৯ সাল এবং কারণ হচ্ছে '৯৯৯৪২ আপোফিস' গ্রাহাণুর মর্মান্তিক হামলা।

বরং এ নিয়ে আমরা সৌর জগতের টক শো শুনি না কেন?

বুধ–ওহে পৃথিবী, শুনেছো নিশ্চয়ই!

পৃথিবী–কি?

বুধ-আরে, তোমার দিন তো ঘনিয়ে এসেছে। ২০২৯ সালে তোমাকে আঘাত হানতে যাচ্ছে স্মারণাতীতকালের সবচেয়ে বড় গ্রহাণুটি, শুনেছো নিশ্চয়ই?

পৃথিবী-তা শুনেছি, সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

বুধ-কেন?

পৃথিবী-আরে, আমার পেটের ভেতর বেয়াদপ মানুষগুলো যতো ধরনের এটম বোমা বানিয়ে রেখেছে তার একটাও যদি ফাটে... তাহলে ২০২৯ সাল পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হবে না।

বুধ-বলো কি!

পৃথিবী-তাহলে আর বলছি কি?

এসময় মঙ্গল টক শো'তে তার নাক গলালো

—আচ্ছা, তুমি ঐ আত্মধ্বংসী মানুষগুলোকে সাইজ করছো না কেন?

পৃথিবী-আরে, আমি ওদের আশ্রয়দাতা না?

মঙ্গল-কিন্তু ওরা তো তোমাকে তিলে তিলে ধ্বংস করতে যাচ্ছে। ঐ গ্রিন হাউস ইফেক্ট তো ওদের কারণেই...।

পৃথিবী-আরে, ভুল করার জন্যই তো মানুষ! ভুল করতে করতেই ওরা শিখে। মতান্তরে বলা যায়, ওদের শেখাগুলো সব ভুল!

মানুষ ভুল করতে থাকুক। আমরা বরং দুই পর্যটক শামুকের কাছে যাই। দুই পর্যটক শামুক রওনা দিয়েছে বিশ্ব ভ্রমণে।

–কোথায় চলেছো তোমরা? জানতে চাইলো এক শুঁয়োপোকা।

–প্রথমে যাবো আফ্রিকা।

–বলো কি? সে তো এখান থেকে তিন হাজার মাইল দূরে। তোমরা পৌছতে পৌঁছতে ততোদিনে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে! জানো তো পৃথিবী বোধহয় ২০২৯ সালে ধ্বংস হচ্ছে।

–সেক্ষেত্রে আমরা রুট বদলে ফেলবো।

–কোথায় যাবে?

–কেন স্বর্গে।

বই মেলা!

একুশের বই মেলা নিয়েতো অনেকই স্মৃতি আছে। প্রায় বিশ বছরেরও বেশি সময় থেকে 'উন্মাদ' নিয়ে মেলা করছি।

শুরুর দিকে মেলার ভিতরের দিকে যেটাকে 'বহেরা তলা' বা 'লিটল ম্যাগাজিন চত্ত্বর' বলা হয় সেখানে খাবারের স্টল হত (বর্তমানে "উন্মাদ স্টল" এর জন্য এটা পার্মানেন্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে!) মূল আড্ডাটা হত ওখানেই। একবার একটা মজায় ঘটনা ঘটেছিল ঐ খাবারের স্টলে। এক তরুণ কবি খেতে বসেছেন, খেয়ে দেয়ে উঠে গেলেন বিল দিতে। তার সদ্য প্রকাশিত কবিতার বইয়ের একটি কপি বের করে বল্লেন "কাইন্ডলি এ্যাডজাস্ট করে নিবেন"।

খাবার দোকানের মালিক এ্যাডজাস্ট করেছিলেন কিনা জানা যায় নি। তবে এক প্রকাশক এডজাস্ট করেছিলেন অন্য কিছু। তিনি একটা বই বের করেছিলেন বইয়ের নাম "এ বইটা চোরের" প্রকাশকের ধারণা হয়েছিল বইটা নামের কারনে হু হু করে চলবে অন্যরকম একটা নাম। কিন্তু হায়! নামের কারণেই কিনা কে জানে বইটা হু হু করে চুরি হতে লাগল। প্রকাশক লস্ ঠেকাতে মানে লস এ্যাডজাস্ট করতে পরের মেলায় মোটামোট জনপ্রিয় এক লেখকের থ্রিলার বই বের করল বইয়ের নাম "উধাও"। তখন মেলায় বই আসত (এখনো আসে) ভ্যানে করে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সেই ভ্যান ভর্তি উধাও বই, উধাও হয়ে গেল এক দুপুরে। সেই লেখক তখন হৃদয়ঙ্গম করলেন বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না ঠিক কিন্তু বইয়ের ব্যাবসা করে দেউলিয়া হওয়া অসম্ভব কিছু না।

বই মেলায় ইদানিং খাবার দাবারের বড় কষ্ট। ভিতরে একমাত্র খাবারের যে স্টলটি আছে তাতে প্রচণ্ড ভীড় খাবার নিম্ন মানের, আর অসম্ভব দাম! একজনতো বলেই বসল পাইরেটেড বই না ধরে এইযে পাইরেটেড খাবার বিক্রি করছে— একে ধরা উচিৎ। একটা নিম্ন মানের ক্লাব স্যান্ডউইচ ৩৫ টাকা! তো একবার অনেক আগে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মেলার ভিতরে বাইরে

খাবার-দাবারের কোন স্টল নেই। ভিতরে থাকলেও তাতে সময়মত কিছু পাওয়া যায় না। বাইরে স্টল নেই কারণ তখন লাগাতার হরতাল চলছিল। (মনে আছে সে সময় মেলায় ভিতরে তরুণ প্রকাশকরা ক্রিকেট খেলত কিছু করার নেই বলে) একজন প্রকাশক তখন খুবই ক্ষুধার্ত কোথায় খাওয়া যায় বুঝে উঠতে পারছিলেন না তার আবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা। শেষ পর্যন্ত তিনি বুদ্ধি একটা বের করলেন। এক ব্যাগ রক্ত দিলেন সন্ধানীকে বিনিময়ে পেলেন একটা কলা, একটুকরো কেক আর এক বোতল সেভেন আপ। ব্যাস তারপরই দুপুরের লাঞ্চে সেটাই সবার মেন্যু হয়ে গেল। সেবারই মনেহয় সন্ধানী সবচে বেশি রক্ত সংগ্রহ করতে পেরেছিল। বেশির ভাগই ক্ষুধার্ত প্রকাশকদের রক্ত!!

মোটাদের চিকন সমস্যা

বেশ মোটা সোটা এক তরুণের শখ হল পাইলট হবে। তাও আবার যেই সেই প্লেনের পাইলট না। ফাইটার প্লেনের পাইলট। যথারীতি ফরম পূরণ করে আবেদন করল তরুণ। যথাসময়ে পরীক্ষার জন্য ডাক পড়ল। পরীক্ষা দিয়ে টিকেও গেল ভাইবাতেও পার। কিন্তু মেডিক্যাল টেস্ট এর পর বলা হল—

— না তুমি বাদ

— কেন স্যার?

— কারণ তুমি অতিরিক্ত মোটা।

— তাতে সমস্যা কি?

— ফাইটার প্লেন এত ওজন বহন করতে পারবে না।

— প্লিজ স্যার আমাকে নিন। দরকার হলে প্লেনে বোম দুটো কম নিব, তবু আমাকে নিন।

আসলে মোটাদের অসুবিধা যেমন আছে সুবিধাও কিন্তু কম না। যেমন মোটাদের লুঙ্গিতে কষ্ট করে গিট দিতে হয় না। কোন মতে টেনে কোমড় পর্যন্ত তুলতে পারলেই হল, ব্যাস নিশ্চিন্ত। মোটারা বাসে চড়লে তার পাশে কেউ বসে না (জায়গা থাকলে তো!) দিব্যি একা একা আরামে যেতে পারে গন্তব্যে। আরো কত সুবিধা!

একবার এক বিশাল মোটা লোক মারা গেল। লোকটা ছিল মহা বদ, স্বাভাবিক ভাবেই তাকে নরকে নেয়া হল। কিন্তু মুশকিল হল নরকের খুপড়ি ঘরগুলোতে তাকে ঢোকানোই যাচ্ছে না। এখন উপায়! ব্যাপারটা স্বর্গে জানানো হল—

— আপনাদের ওখানে একটু জায়গা হবে?

— কেন?

— মানে একজন মোটা লোককে নরকের খুপড়ি ঘরগুলোতে ঢোকানো যাচ্ছে না।

— তাই বলে নরকের লোক স্বর্গে? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?

— তা হলে কি করব? কোথায় রাখব ওকে?

— ওকে পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।

— সে কি করে সম্ভব?

— সম্ভব সম্ভব ও রাজনীতি করত না? পৃথিবীতে ওরা না থাকলে পৃথিবীটাকে নরক বানাবেটা কে শুনি?

—সব শেষে সেই 'ফ্যাট জোক' এক ফ্যাট লোক নিজের ওজন মাপতে ওজন মেশিনে বহু কষ্টে দাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে অত্যাধুনিক ওয়েট মেশিন থেকে ছোট কার্ডে মেসেজ বের হল। ওয়েট স্ট্যান্ডে এক সঙ্গে তিনজন দাড়াবেন না। একজন একজন করে দাড়ান... প্লিজ।

ক্রেডিটে প্রেম

ভ্যালেন্টাইন ডে-তে একটি বিখ্যাত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ঠিক করল, প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির ভাস্কর্যে প্রাণ সঞ্চার করবে তারা। স্পন্সরও করবে তারা, ফলে নতুন ধরনের একটা বিজ্ঞাপন হবে। পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞানীদের আহ্বান করা হলো... এমন কিছু আবিষ্কার করতে হবে, যা দিয়ে প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির পাথরের ভাস্কর্যে প্রাণ সঞ্চার হবে। যে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করতে পারবে, তাকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ পুরস্কৃত করা হবে। সাজ সাজ রব পড়ে গেল বিজ্ঞানীদের মধ্যে। সময় খুব বেশি নেই হাতে। অবশেষে এক বিজ্ঞানী সেই অসম্ভবকে সম্ভব করল। সে বিশেষ এক ধরনের স্প্রে আবিষ্কার করল, যা যেকোনো মূর্তির গায়ে স্প্রে করলে মূর্তি বা ভাস্কর্য প্রাণ ফিরে পাবে। যথাসময়ে পৃথিবীর বিখ্যাত সব নিউজ মিডিয়া এসে হাজির হলো প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির ভাস্কর্য চত্বরে— সাংবাদিক, ভিজে, আরজে, ফটোগ্রাফার... পা ফেলার জায়গা নেই। দিনটাও ভ্যালেন্টাইন ডে!

তো বিখ্যাত প্রাণসঞ্চারক স্প্রে আবিষ্কারক বিজ্ঞানী স্প্রে হাতে এগিয়ে এলেন। সঙ্গে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এমডি, ক্লিক ক্লিক ছবি উঠছে। বিজ্ঞানী মূর্তির গায়ে স্প্রে করল! সবাই দম বন্ধ করে আছে! সত্যি কি প্রাণ ফিরে পাবে মূর্তি? যদি প্রাণ পায়, কি ডায়ালগ দেবে এই মহান ভ্যালেন্টাইন ডে-তে? নিশ্চয়ই প্রেমের কোনো মহান ডায়ালগ হবে! কী হবে সেটা? মূর্তি সত্যি সত্যি প্রাণ পেল, নড়েচড়ে উঠল। লাফিয়ে নেমে এল বেদি থেকে, তারপর চিৎকার করে বলল, 'কেউ আমাকে জলদি একটা রাইফেল দাও।'

সবাই অবাক! প্রেমের দেবীর মুখে 'রাইফেল'।

— কেন, কেন?

— আপনি রাইফেল চাইছেন কেন? সাংবাদিকেরা জানতে চান!

আমি সব পাখিকে গুলি করে মারব আগে, তারপর অন্য কথা।

এবার অন্য গল্প, মূর্তি বা ভাস্কর্য নয়, মানুষ। এই মানুষটিও প্রেমের কারণে বিখ্যাত, আরও বিখ্যাত কারণ, সে কাকতালীয়ভাবে মারা গেছে ভ্যালেন্টাইন ডে-

তেই! ধরা যাক তার নাম মি. এল (এল এ লাভ, তাই)। মি. এল-এর মৃত্যুসংবাদ শুনে সবাই ছুটল তাঁর কাছে। শয়ে শয়ে মানুষ ছুটছে তার কাছে।

— তিনি তাহলে প্রেমের কারণেই বিখ্যাত? জানতে চান এক সাংবাদিক ছুটন্ত মানুষদের কাছে।

— হ্যাঁ, তিনি এক মহান প্রেমিক।

— কিন্তু কেন মহান?

— কারণ তিনি তাঁর প্রেমিকাকে যত গিফট করেছেন, পৃথিবীতে আর কোন প্রেমিক এত গিফট করে নাই।

— বলেন কী!

— হ্যাঁ, এ জন্যই তিনি বিখ্যাত।

— কিন্তু এত এত লোক ছুটছে, এরা কি সব তাঁর ফ্যান? সবাই তো পুরুষমানুষ দেখছি।

— না, ঠিক ফ্যান বলা যাবে না।

— তাহলে? উদগ্রীব সংবাদিক জানতে চান।

— এরা সবাই বিভিন্ন গিফট শপের মালিক। তিনি আবার সব সময় দোকান থেকে ক্রেডিটে গিফট কিনতেন কিনা!

লাইম লাইটে তাস

এক লোক তার পোষা অসুস্থ মুমূর্ষু কুকুরকে নিয়ে গেল এক ভেট-এর কাছে। ভেট একনজর দেখেই মাথা নেড়ে বলল—

'গন কেস'

— মানে?

— মানে আপনার কুকুর মারা গেছে।

— আপনি তাকে ভালোমতো না দেখেই বলে দিলেন মারা গেছে?

— আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ...। ভেট এবার ছোট্ট একটা শিষ দিল। মুহূর্তেই ছুটে এল একটা বিড়াল। এসে কুকুরটার মুখের কাছে একটু শুঁকল। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

দেখলেন? দেখলেন তো? আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, এখন দেখুন বিড়ালটাও বুঝে গেছে আপনার কুকুর আর ইহজগতে নেই। পশুর মৃত্যু পশুর চেয়ে আর ভালো কে বুঝবে বলুন!

কুকুরের বিমর্ষ হতাশ মালিক মেনে নিল তার হতভাগ্য কুকুরের নিয়তি। এ সময়ে ভেট নিরীহ মুখে একটা প্যাডের কাগজ বাড়িয়ে দিল।

— ওটা কী?

— আমার বিল!

— বিল? বিল দেখে কুকুরের মালিক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল— 'কী বলছেন?... শুধু মুখে বললেন কুকুরটা মারা গেছে এর জন্য বিল এগারো শ পঞ্চাশ টাকা?'

— না না, আপনি ভুল বুঝছেন। আমার বিল বেশি না, মাত্র পঞ্চাশ টাকা।

— তাহলে এই এগারো শ টাকা কিসের?

— ক্যাটস স্ক্যান।

এতো গেল এনিমেল স্ক্যানের গল্প। এবার মনুষ্য স্ক্যানের গল্প শোনা যাক। ঢাকা শহরে ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ নিয়ে দুই লোক একটা হোটেলে উঠল।

— খালি রুম হবে?

—হবে। তার আগে আপনাদের ব্যাগগুলো ঐ চলমান ট্রেটার ওপর রাখুন।

—মানে?

— মানে এগুলো স্ক্যান করতে হবে।

— কেন? স্ক্যান করতে হবে কেন?

হোটেলের লোকেরা তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে স্ক্যান শুরু করে দিল। এবং হঠাৎ একজন আর্কিমিডিসের মতো সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউরেকা ইউরেকা...!!'

—কী পাওয়া গেছে? উদ্বিগ্ন লোকটি জানতে চায়।

— তাস। তাসের প্যাকেট।

— তাতে সমস্যা কী?

— আপনি আমাদের হোটেলের রুম বসে তাস খেলবেন? আরে আমাদের হোটেলের নিচেও একটি প্রাইভেট ব্যাংক আছে, সেখানে লকারও আছে।

আগে মুরব্বিরা বলত,

'দাবা, তাস, পাশা— তিন সর্বনাশা।'

দাবা আর পাশার কথা জানি না, তবে তাস যে সর্বনাশা তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। শুক্রাবাদের নীদমহল হোটেলের রুমে কয়েকজন প্রতিভাবান বোর্ডার দিনের পর দিন তাস খেলে.. তারপরের ইতিহাস তো সবাইজানে। গ্রাহকদের লকার ভেঙে ২০ কোটি টাকার অলংকার নিয়ে লাপাত্তা! তবে এটাও ঠিক, ইনডোর গেম হিসেবে তাস এখন লাইম লাইটে। আগে ধারণা ছিল, পয়সা বোধহয় শুধু ক্রিকেট-ফুটবলের মতো আউটডোর গেমেই। 'লকার ব্রেকাররা' সে ধারণার মর্মমূলে ইলেকট্রিক কাটার চালিয়েছে, বলাই বাহুল্য!!

ক্যাট স্ক্যান দিয়ে শুরু করেছিলাম। ক্যাটওয়াক দিয়ে শেষ করি। বাংলাদেশের এক বিখ্যাত মডেল চলছে ফ্রান্সে, গিমে মিউজিয়ামের (!) গ্যালারিতে ক্যাটওয়াক হবে। কারণ, তিনি আন্তর্জাতিক মানের ক্যাটওয়াক করে থাকেন। মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিখ্যাত মডেল চললেন এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। কিন্তু একটু বাদেই ফিরে এলেন!

— কী হলো? ফিরে এলে যে? মা-বাবা দুজনেই অবাক!

— আজ যাব না।

— কেন?

— আজকের যাওয়াটা শুভ হবে না।

— কেন?

— যাওয়ার সময় সামনে দিয়ে একটা কালো বিড়াল হেঁটে গেল যে?

মামু ভাগ্নে যেখানে বিপদ সেখানেই...

'মামু ভাগ্নে যেখানে বিপদ নাই সেখানে'। কথাটা কতটা সত্য বলা মুশকিল। 'অর্ধসত্য' হতে পারে কিন্তু আরেক বিখ্যাত দার্শনিক বলেছেন অর্ধসত্য হচ্ছে— পুরোটাই মিথ্যা। সে যাই হোক একটি বাস্তব ঘটনা দিয়ে বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করার সময় হয়েছে মনে হয়।

অনেক বছর আগে ঘটনা আমি আর আমার ছোট মামু বাসায় একদম একা আর সবাই গেছে বেড়াতে। দুই সদ্য তরুণ বাসায় একা থাকলে যা হয়। নতুন সিগারেট খাওয়া শিখেছি ঘরে বসে সিগারেট খাই আর উচ্চ স্বরে গান শুনি বন্ধুরাও খবর পেয়ে চলে আসে ইচ্ছামত আড্ডা সিনেমা দেখা চলছে। বেশ ভালই চলছিল কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে 'ঠাডাপাত' মানে বজ্রপাত আর কি!! কি ব্যাপার আমাদের এক আত্মিয় এসে হাজির। অতি বিরক্তিকর আত্মিয়। আব্বার কেমন দূর সম্পর্কের ভাই হয়।

— ভাবীসাব নাই?

— না, আম্মাতো নাই।

— কবে আসবেন?

— ঠিক নাই।

— হুম যাক এসেই যখন পড়েছি ক'টা দিন থেকেই যাই ঢাকাতে। আসাই হয় না। বলে সেই অতিথি ব্যাগ এন্ড ব্যাগেজ নিয়ে ঢুকে পড়ল বাসায়। মামা আর আমি হায় হায় করে উঠলাম। এখন কি হবে! আম্মা থাকলে অতিথি কোন বিষয় না। কিন্তু এই সময় অসম্ভব! আমরা ঠিক করলাম যেকোন মূল্যে একে দূর করতে হবে। আমি আমতা আমতা করে বল্লাম।

— ইয়ে চাচা আম্মা নেই এসময় থাকবেন রান্না বান্নাতো সব বন্ধ কোথায় খাবেন কি আমরাই হোটেলেই খাই।

— আরে এটা কোন বিষয় না। আমি ভাল রাধতে পারি। দাড়াও গোসলটা সেরে নেই তারপর দেখ রান্না কাকে বলে ডিম আছে না ঘরে?

আমি আর মামা দেখলাম সর্বনাশ এতো এঁটেল মাটি! একে এভাবে দূর করা যাবে না অন্য বুদ্ধি করতে হবে। কিন্তু সেটা কি?

ঠিক করা হল ঐ 'উৎপাত চাচা' যখন সন্ধ্যায় বের হয়ে যাবে বৈকালিন ভ্রমণে। তখন আমরাও বের হয়ে যাব সারা রাত বাইরে আড্ডা মারব তারপর সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে গভীর রাতে বাড়ি ফিরব ততক্ষণে সে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আশ্রয় নিবে। যেই ভাবা সেই কাজ। সে বৈকালিন ভ্রমণে বেরুনো মাত্র আমরাও বেড়িয়ে পড়লাম বাসায় তালা মেরে।

রাতে আড্ডা টাড্ডা মেরে চলে গেলাম শ্যামলী হলে। তখন আমাদের বাসা মোহম্মদপুরে বাবর রোড। পাশেই শ্যামলী হল। সেকেন্ড শোর টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম মামু-ভাগ্নে। সিনেমাটাও খুব খারাপ ছিল না। তখন শ্যামলী হলে ভাল ভাল ইংরেজি ছবি আসত। ছবিটা ছিল জেমস কোবার্ন ম্যান অভিনীতি 'আওয়ার ম্যান ফ্লিন্ট' দারুণ রুদ্ধ শ্বাস ছবি। দুজনেই রুদ্ধ শ্বাসে দেখছি। শেষ সীন নায়ক মানে জেমস কোবার্ন অত্যন্ত ঝুকি নিয়ে নায়িকাকে উদ্ধার করল, আমরাও স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললাম। ঠিক তখনই আরেকটি নিঃশ্বাসের শব্দ পেলাম পিছনে।

— না ছবিটা ভাল। বল্ল কেউ, চেনা কণ্ঠ। পিছনে তাকিয়ে দেখি। সেই অতিথি চাচা! ঠিক আমাদের পিছনে বসা। তিনিও আমাদের মত সেকেন্ডে শো ছবি দেখতে চলে এসেছেন।

— বুঝলা শাহীন তোমাদের দেরী দেখে আমিও বুদ্ধি করে টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম। চল যাওয়া যাক!!

প্রিয় পাঠক এখন আপনারাই বিচার করুন এই লেখার হেডিংটা ঠিক আছে কিনা!

সুসংবাদ বনাম দুঃসংবাদ

সুসংবাদ দুঃসংবাদের সেই কমন গল্পটাতো সবার জানা সেই চর্বিত চর্বন জোকস। এক লোকের পায়ে সমস্যার তখন ডাক্তার এসে বল্ল—

— আপনার জন্য একটা সুসংবাদ আর একটা দুঃসংবাদ আছে কোনটা আগে শুনতে চান?

— দুঃসংবাদটাই আগে শুনি

— আপনার দুপায়েই গ্যাংগ্রিন হয়েছে দুটোই কেটে ফেলতে হবে।

— আর সুসংবাদ?

— আপনার জুতা জোরা পাশের বেডের একজন কিনতে চেয়েছেন।

সেই গ্যাংগ্রিন হওয়া লোকটি অবশ্য রাজি হল না। মানে পা কাটতে রাজি হল না। সে অন্য একটা হাসপাতালে গেল। অন্য হাসপাতালের ডাক্তার পরীক্ষা নিরিক্ষা করে বল্ল—

— আপনার জন্য সুসংবাদ দুঃসংবাদ আছে কোনটা আগে শুনবেন?

— সুসংবাদটাই আগে শুনি।

— আপনার একটা পা ভাল আছে।

— আর দুঃসংবাদ?

— অন্য পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়েছে ওটা কেটে ফেলতে হবে।

লোকটি ভাবল, মন্দ কি একটা পাতো তবু বাঁচালো হাসপাতাল বদল করে। সে এক পা কাটার অনুমতি দিল।

কদিন পর ডাক্তার ফের আসলো—

— আপনার জন্য আবারো সুসংবাদ দুঃসংবাদ আছে।

— উফ আবারো সুংবাদ দুঃসংবাদ ??

— কোনটা আগে শুনতে চান?

— সুসংবাদটাই শুনি।

— আপনার গ্যাংগ্রিন হওয়া পাটা ভালো হয়ে উঠছে।

— আর দুঃসংবাদ?

— কিন্তু সার্জন ভুল করে ভালো পাটা কেটে ফেলেছে আগেই!!

পা হাড়ানো লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে ততক্ষণাৎ ঐ হাসপাতাল ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল। হুইল চেয়ারে করে তাকে নেয়া হচ্ছে কিন্তু লিফট বন্ধ। লোকটি মানে পা হারানো লোকটি হাউ মাউ শুরু করে দিল। 'এই মুহূর্তে লিফট চালু করে আমাকে বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন নইলে আমি মান হানির মামলা করব।'

হাসপাতালের লোকজন ছোটাছুটি শুরু করল এমনিতেই এই লোকের একটি পা ভুল করে কাটা হয়েছে! তার উপর...

হাসপাতালের ইনচার্জ ছুটে এল, জানাল

— স্যার লিফটটা লক হয়ে গেছে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। একটু ধৈর্য্য ধরুন... প্লিজ...

লোকটি ধৈর্য্য ধরল। কিছুক্ষণ বাদে ইনচার্জ আবার ছুটে এল—

—স্যার আপনার জন্য সুসংবাদ দুঃসংবাদ আছে।

— উফ! আবার সুসংবাদ দুঃসংবাদ??

— জি জনাব কোনটা আগে শুনবেন?

— সুসংবাদ।

— আমরা লিফট মেরামতকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হয়েছি।

— আর দুঃসংবাদ?

— এ্যাঁ ইয়ে মেরামতকারী লিফটের ভিতর আটকা পড়েছে।

প্রাচীন ভালবাসা

ভালবাসা প্রাচীনকালে কেমন ছিল? মানে সেই আদিম কালে। মানুষ যখন গুহায় বাস করত? তখন কেমন ছিল প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক? কল্পনা করতে দোষ কি? এক গুহাবাসী ছুটে এল তার প্রেমিকের কাছে—

— শুনেছ? সর্বনাশ হয়েছে।

— কি হয়েছে?

— আমার মার গুহায় একটা হিংস্র ম্যামথ ঢুকে পড়েছে।

— তাতে সমস্যা কি?

- তুমি আমার প্রেমিক কিছু একটা কর।
- ম্যমথ হাতির কি ক্ষতি হলো তাতে আমার কিছুই যায়-আসে না।

এবার আসা যাক আধুনিক যুগে।

ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে প্রেমিক-প্রেমিকা সারাদিন ডেট করে ঢুকল একটা দামি রেস্টুরেন্টে খেতে। খাওয়া-দাওয়া শেষে প্রেমিক হায় হায় করে উঠল।

— কী হলো? জানতে চায় প্রেমিকা।

— আমার মানিব্যাগ খোয়া গেছে।

— জানতাম এমনটা হবে। তাই আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। সব ছেলেরাই এমনটা করে যুগ যুগ ধরে...।

অপ্রস্তুত প্রেমিকের সামনে ভ্যানিটি ভ্যাগ খুলে প্রেমিকা গম্ভীর মুখে বিল মিটাল। তারপর তারা রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে এল। প্রেমিক প্রেমিকাকে তার বাসায় পৌঁছে দিল। পথে কোনও কথা হলো না। বিদায় নেয়ার মুহূর্তে প্রেমিকা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে বাড়িয়ে দিল প্রেমিকের খোয়া যাওয়া শূন্য মানিব্যাগটি।

সবশেষে ভালবাসার সেই ক্লাসিক গল্পটি শোনা যাক...।

— তুমি আমার ভালবাসা পেতে পার একটা কাজ যদি কর। সুন্দরী প্রেমিকা বলে।

— কী কাজ?

— তোমার মাকে হত্যা করে তার হৃদপিণ্ডটি এনে দিতে হবে। পারবে?

— পারব। দ্বিধান্বিত গলায় বলে ব্যাকুল প্রেমিক।

— বেশ তাহলে নিয়ে এসে। উদভ্রান্ত প্রেমিক ছুটল মায়ের কাছে। মাকে হত্যা করল। তার বুকের পাজর ছিঁড়ে বের করল তাজা হৃদপিণ্ড।

তখনও ধুকপুক করছে হৃদপিণ্ডটি। প্রেমিক উদভ্রান্তের মতো ছুটল প্রেমিকার কাছে। বন্ধুর পথ! পথে হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রেমিক। হাত থেকে ছিটকে পড়ল তার মায়ের হৃদপিণ্ডটি।

হৃদপিণ্ডটা তুলে নিতে যাবে এ সময় কথা বলে উঠল মায়ের হৃদয়...

"বাছা ব্যথা পেয়েছ?"

এবার পাঠকরাই বিচার করবেন প্রকৃত ভালবাসা কার? তবে প্রকৃত ভালবাসা আসালে প্রকৃতির, কারণ এখনও আত্মধ্বংসী মানব জাতিকে আগলে রেখেছে... সেই প্রকৃতিইতো!!

কবি ও কাক

কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই লেখাটা শুরু করি...

'দেশে কাক ও কবির সংখ্যা বেশি' এরকম একটি বাক্য মাঝে মাঝে শোনা যায়। কিন্তু ইদানীং ব্লার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে কাকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে! ফলে কবিরা লাইম লাইটে।

অবশ্য কবিরা সবসময়ই লাইম লাইটে। এই দেশ কবিদের দেশ। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আর জীবনানন্দ দাশ— এই তিন বিখ্যাত কবি বাংলাদেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন যেন। বাংলাদেশ বাঁধা থাকুক আমরা অন্য এক কবির কাছ থেকে ঘুরে আসি। এই কবি কবিতা লিখেন কিন্তু কেউই তার কবিতা ছাপে না। শেষমেষ রেগেমেগে সেই তরুণ কবি গিয়ে হাজির হলো এক পত্রিকা অফিসে।

—দেখুন আপনি নিশ্চয়ই এই পত্রিকার সম্পাদক?

—হ্যাঁ

— দেখুন আমি এ নিয়ে ছত্রিশটা কবিতা আপনার পত্রিকায় পাঠিয়েছি। কিন্তু একটাও ছাপেননি আপনি।

— হ্যাঁ ছাপিনি। সম্পাদক স্বীকার করলেন।

— দেখুন আমি সাঁইত্রিশ নম্বর কবিতাটা এনেছি এটা যদি না ছাপেন আমি কিন্তু ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাব। সম্পাদক ভয় পেয়ে গেলেন। এ যুগের ছেলেপেলে, বিশ্বাস নেই কখন কি করে ফেলে। তিনি রাজি হলেন সাঁইত্রিশতম কবিতাটি ছাপতে। কবি হৃষ্টচিত্তে বের হয়ে গেল।

তারপর কবিতাটি ছাপা হলো। কবি একদিন গিয়ে হাজির কবিতার বিলের জন্য। সম্পাদক বিল দিয়ে বললেন, আচ্ছা বলতো সেদিন যে তুমি বলেছিলে কবিতা না ছাপলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাবে, সেটা কী কাণ্ড?

— কবিতা লেখা ছেড়ে দিতাম। বিল পাওয়া তরুণ কবির নির্বিকার উত্তর।

আরেক কবি। ইনিও তরুণ, তার শখ হয়েছে কবিতার বই বের করবে, সামনে একুশের বইমেলা। প্রকাশক কবিতার পাণ্ডুলিপি দেখে বলল—

— বিয়ে করেছেন?

— না।

— আগে বিয়ে করেন।

— কেন, বিয়ে করার সাথে কবিতার বই বের করার সম্পর্ক কি?

— আপনার কবিতার বই-এর অন্তত একজন পাঠক তো চাই?

এক বছর পরের ঘটনা।

সেই কবি আবার গিয়ে হাজির।

সঙ্গে বইয়ের পাণ্ডুলিপি।

— আপনি!

— জী আমি, সেই যে কবিতার বই বের করতে এসেছিলাম।

— ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। তা কি ব্যাপার?

— আপনি বলেছিলেন বিয়ে করতে, বিয়ে করেছি।

প্রকাশক বিপদে পড়লেন। কিন্তু কথা যখন দিয়ে ফেলেছেন, উপায় কি? বিরস মুখে বললেন 'দেখি পাণ্ডুলিপি'। পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে প্রকাশক অবাক!

— কবিতা কই? এ তো দেখছি কঠিন সব প্রবন্ধ!

— জী, বিয়ের পর আর কবিতা বেরুচ্ছে না যে!

ডিমের ওমলেট

আমার এক মালদার বন্ধু একবার আমাকেসহ কয়েক বন্ধুকে খাওয়াতে এক ফাইভস্টার হোটেলে নিয়ে গেল। (উপলক্ষ্যটা কি ছিল এখন আর মনে পড়ছে না।) যথারীতি আমরা টেবিলে বসলাম, মানে ঠিক টেবিলের উপরেই বসলাম না, টেবিল সামনে নিয়ে চেয়ারে বসলাম। কিছুক্ষণ পর ফাইভ স্টার হোটেলের ওয়েটার কি সব খাবার দাবার দিয়ে গেল। আমি লক্ষ্য করলাম প্লেটে গোল একটি বস্তু। হাত দিয়ে বুঝলাম সেটা একটা রুটি! ওটাই ছিড়ে ছিড়ে খাওয়া শুরু করলাম। খেয়ে যখন প্রায় শেষ করে এনেছি তখন আমার মালদার বন্ধু আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল–

'করছিস কি? ওটা তো হাত মোছার জন্য দিয়েছে, তুই ওটাই খেয়ে ফেললি? আসল খাবার তো আসছে!'

এতো গেল বড়লোকী হোটেলে খাওয়ার বিড়ম্বনা। এবার যাওয়া যাক এক ফাইভ স্টার বাসায়। মানে অত্যন্ত ধনী এক বাসায় গেলাম যথারীতি আমার সঙ্গে সেই বন্ধু। কিছুক্ষণ পর প্রায় অতি রুপসী এক তরুণী একটা ট্রলি জাতীয় কিছুতে করে ঠেলে প্লেট কাঁটা চামচ ইত্যাদি নিয়ে এল। আমি তরুণীকে সালাম টেলাম একটা কিছু দেয়ার চিন্তা ভাবনা করছি, তখন আমার স্মার্ট বন্ধু ঠেলা দিয়ে হুশিয়ার করে দিল এ মেয়ে এ বাড়ির বুয়া! আমি সাবধান হয়ে গেলাম। মেয়েটি আমাদের দুজনের সামনে কাঁটা চামচ ছুরি আর ত্রিকোণাকার একটা বস্তু (সম্ভবত কেক টেক একটা কিছু হবে) সাজিয়ে দিয়ে গেল। যথারীতি আমার বন্ধু আমাকে সাবধান করল–

' দেখিস ক্ষ্যাতের মতো আবার হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করিস না। ডান হাতে ছুরি বাম হাতে কাঁটা চামচ ধরিস কিন্তু।'

'ঠিক আছে।' আমিও ফিস ফিস করি। তবে এবার আর আমি আগে আগে শুরু করি না। বন্ধুই ছুরি, কাঁটা চামচ বাগিয়ে ধরে ঐ ত্রিকোণাকার বস্তুটি কাটার চেষ্টা করতে লাগল এবং অচিরেই আমরা দু'জনেই আবিষ্কার করলাম ঐ

ত্রিকোণাকার বস্তুটি কেক বা কোনো খাদ্য বস্তু নয় ওটি বিশেষ কায়দায় ভাজ করা একটি ন্যাপকিন। আসল খাবার এল একটু পরে।

যা হোক খাওয়া খাদ্যের গল্পই যখন হচ্ছে এবার ঐ সংক্রান্তই একটা গল্প শোনোনো যেতে পারে।

এক লোক গেছে দামি একটা রেস্টুরেন্টে ব্রেকফার্স্ট করতে। ওয়েটার ছুটে এল–

'কি লাগবে স্যার?'

' তোমাদের আজকের স্পেশ্যাল মেন্যু কি?'

'স্যার আমরা মুরগীর জিহ্বা দিয়ে বিশেষ ধরনের একটা স্যুপ করেছি...'

'ছিঃ ছিঃ কি বলছ? মুরগীর জিহবা? ব্যাপারটা তো নোংরা, মুরগী জিহবা দিয়ে কত নোংরা খাবার খায় লালা টালা লেগে থাকে ভাবতেই কেমন লাগছে।'

'তাহলে কি দেব স্যার?'

'তুমি দশ মিনিট পরে এস আমি ভেবে দেখি।'

ওয়েটার সালাম দিয়ে চলে গেল। ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন।

দশ মিনিট পর ওয়েটার এল,

'কি দেব স্যার?'

'একটা মুরগীর ডিমের ওমলেট!'

বুলডজারের সাজা

সেদিন খবরে দেখি কল্যাণপুরে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে বস্তি ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। ঐ বস্তির পনেরো হাজার দরিদ্র মানুষ ছোটাছুটি করছে, তাদের মালপত্র নিয়ে। বড্ড করুণ দৃশ্য। তার পরের খবরটা বিশ্ব এস্তেমার খবর। সাত লাখ মুসলিমকে টঙ্গিতে কোথায় জায়গা দেওয়া হবে তাই নিয়ে ছোটাছুটি করছেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উপরের দু'টি ঘটনা একটি ইহলৌকিক, আরেকটি পরলৌকিক। একটা নিশ্চিত অন্যটি অনিশ্চিত। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মহান বানী মনে পড়ছে, " যে ইশ্বর এই পৃথিবীতে আমাকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান দেন নি। তিনি যে স্বর্গে আমাকে মহা সুখে রাখবেন তা আমি কখনোই বিশ্বাস করি না!"

বস্তি উঠিয়ে দেয়াটা অবশ্য আমাদের দেশে নতুন কোন ঘটনা নয়। কখনো আগুন ধরিয়ে উঠিয়ে দেয়া হয়, কখনো বা বুলডোজার দিয়ে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়। তো এমনি এক বুলডোজার যে বহু বস্তি ভাঙার সাক্ষী তাকে নেয়া হল নরকে।

'হুজুর আমার কি দোষ? আমি তো যন্ত্র মাত্র। মানুষই আমাকে চালায়। সাজা দিলে মানুষকে দিন।' বলল বুলডোজার।

'আরে স্বর্গ-নরকের নিয়ম কানুন আজকাল বদলে গেছে। যন্ত্রদেরও সাজা পেতে হয় এখন। বল কি সাজা চাও তুমি?'

'হুজুর সে আপনি ঠিক করে দিন।'

'এক কাজ করো তুমি নরকটা ঘুরে দেখ, তারপর তোমার পছন্দ মতো একটা সাজা বেছে নাও।'

' বেশ।'

বুলডোজার বিষণ্ন বদনে নরক পরিভ্রমনে বের হল। কিছুদূর গিয়ে দেখে একটা ট্রাক বিশাল এক পবর্তকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার... কারবুরেটর গরম হয়ে গেছে গোঁ গোঁ করছে।

'একি অবস্থা তোমার?'

'আর বল না হে। পৃথিবীতে থাকতে কত মানুষ চাপা দিয়েছি তাই এখন এই শাস্তি... সকালে এই পাহাড়টাকে টেনে নিয়ে যাই স্বর্গে, বিকালে ফের টেনে নিয়ে আসি... গত বিশ বছর ধরে এই চলছে...ওফ!'

'আচ্ছা তোমার জানা মতে হালকা ধরনের কোনো সাজা আছে এখানে?'

'আছে।'

'কি বলতো?' খুশি হয়ে উঠল বুলডোজার।

'যেয়ে দেখ ঐ সামনে ডান দিকে।'

বুলডোজার যেয়ে দেখে ওটা কোনো শাস্তিই না। একটা সদ্যপ্রসূত বাচ্চা শুয়ে, তাকে বুলডোজার দিয়ে ঠেলে খাদে ফেলে দিতে হবে।

'ওটা কোনো শাস্তি হল?'

'হ্যাঁ ওটাই শাস্তি।' বলল নরকের রক্ষি।

বুলডোজার গর্জন করে ছুটে গেল বাচ্চাটাকে ঠেলে ফেলে দিতে কিন্তু আশ্চর্য এক চুলও নড়াতে পারল না। দিন যায়, বছর যায় ডোজারের চাকা বসে গেল মাটিতে। সামনের স্টিলের পুশিং বাম্পার ভেঙ্গে পড়ল, কিন্তু সদ্য জন্মানো বাচ্চাটিকে এক চুলও নড়ানো গেল না।

'এ বাচ্চাটি কে?' ঘামতে ঘামতে চিৎকার করে উঠল ক্লান্ত শ্রান্ত বুলডোজার। নরকের রক্ষি রহস্যময় হাসি হাসল।

'এ আর কেউ নয় মানুষের অমর মৃত্যু!'

মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে না। তারপরও পৃথিবীর কিছু কিছু মানুষ মৃত্যুকে জয় করেন। এমনি একজন মানুষ মৃত্যু সম্পর্কে একটা মজার উক্তি করেছিলেন, "মৃত্যুকে আমার ভীষণ ভয় তাই ঐ ব্যাপারটা যখন আমার বেলায় ঘটবে তখন আমি তার থেকে একশো হাত দূরে থাকব।"

বুশের সাজা

সাদ্দাম হোসনেকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছিল তখন তাকে দাড়ি-গোঁফে দেখাচ্ছিল যেন অনেকটা টলস্টয়ের মতো। রবার্ট ফিস্ক অবশ্য বলেছেন তার চোখ যদি হয় চে গুয়েভেরার তবে দাড়ি যেন ফিদেল ক্যাস্ট্রোর। তবে তাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বিশেষ করে চোখ দু'টি... যেন তিনি এখন সেই বিখ্যাত কবিতার দুটি লাইন...

'ক্লান্ত চোখ ক্লান্ত চোখের পাতা
তার চেয়ে ক্লান্ত আমার পা...'

তো বিশ্ব দরবারে সাদ্দামকে নিয়ে এখন দেন দরবার চলছে। তার মৃত্যুদণ্ড যেন এখন স্টেশনারী দোকানের সামান্য পেন্সিলের গায়েই লেখা আছে 'টু বি... অর নট টু বি...' মৃত্যুদণ্ড হোক আর না হোক সাদ্দাম হোসেনকে একদিন স্বাভাবিকভাবেই মারা যেতে হবে। বুশকেও। তারপর কি হবে। চলুন দেখা যাক...

নরকের তিন নম্বর সেকশনে আপ সাইট ডাউন অবস্থায় ঝুলছে প্রেসিডেন্ট বুশ। আর এক মুস্কো জোয়ান একটা মুগুর দিয়ে ধুমসে পিটাচ্ছে তাকে। বুশ পরিত্রাহি চিৎকার করে বলল–

'এর মানে কি? আমি সারা জীবন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে কাজ করলাম আজ এই তার পুরস্কার?'

'তোমার কি পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল?'

মুগুরবাজ ক্ষনিকের জন্য প্যাঁদানি থামিয়ে প্রশ্ন করল।

'অবশ্যই স্বর্গ।' হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল বুশ।

'হ্যাঁ, স্বর্গেই তো তুমি এসেছ।'

'স্বর্গে এসে থাকলে এই নরকে আমাকে... ওরে বাবাগো... (আবার মুগুর ধোলাই শুরু হয়েছে!)

'কেন তোমাকে পেটানো হচ্ছে?' মুগুরবাজ তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল-

'হ্যাঁ, আমি এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা চাই... এই প্রহসনের মানে কি?'

'প্রহসন না, আসলে পৃথিবীতে এখন ফ্রি মার্কেটের যুগ চলছে... তার উপর সব জায়গায় চলছে "ফ্রি কালচার"... দেখছ না কিছু কিনতে গেলেই সাথে একটা কিছু ফ্রি...'

'এর সাথে আমার এই নরক নির্যাতনের সম্পর্ক কি?'

'ওই যে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছ তুমি স্বর্গই... কিন্তু সাথে ফ্রি এই নরকের প্যাঁদানি...' বলেই সে ফের মুগুর চালাতে শুরু করল ধুপধাপ।

এত গেল সাদ্দামের প্রসঙ্গ, কিন্তু সাদ্দামের লুক এলাইক যারা ছিল তাদের কি হবে? তারা কোথায় যাবে, স্বর্গে না নরকে?

এ নিয়ে আবার সওয়াল জবাব শুরু হল।–

'আচ্ছা সাদ্দামের লুক এলাইকরা কোথায় যাবে? স্বর্গে না নরকে?'

'অবশ্যই নরকে।'

' কেন? তারা বিশ্ববাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাদের সাদ্দাম ভেবে সবাই বার বার ভুল করেছে!

'এতে তাদের দোষ কি? তাদের হয়তো বাধ্য করা হয়েছিল...'

'না না তাদেরকে নরকেই যেতে হবে।'

'অন্তত তাদের স্বর্গ-নরকের নো ম্যানস ল্যান্ডে...'

যা হোক, শেষ পর্যন্ত নানান দেন দরবার করে সর্বসম্মতিতে ক্রমে তাদের নরকেই নেয়া হল। তবে তাদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। নরকে সাজাপ্রাপ্ত বিখ্যাত এক পরিচালক তাদের নিয়ে ক্লোন-এর উপর একটা ডকুড্রামা করছেন। এসব ক্রিয়েটিভ কাজ তো আর স্বর্গে থাকলে করা যেত না।

বাংলা ভাষার উনিশ বিশ

'যত যাই বল বাংলা ভাষাকে সত্যিকার অর্থে টিকিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।'

'মানে?'

'মানে তুই দ্যাখ বাংলা ভাষায় অনেক অক্ষর আমাদের লেখালেখি থেকে উঠে গেলেও রেলওয়ে কিন্তু ঠিক ধরে রেখেছে।'

'কি রকম?'

'যেমন ধর রেলওয়ের বগিগুলোর নাম "ঞ" "উ" "৯" (লি) ইত্যাদি বর্ণগুলো রেলওয়ে বগি ছাড়া আজকাল আর কোথাও ব্যবহার হতে দেখিস?'

' সে ক্ষেত্রে ক্রেডিট শুধু বাংলাদেশ রেলওয়ের নয় আরেক জনকেও ক্রেডিট দিতে হবে।'

'কাকে?'

'মেট্রিক্স ছবির হিরোকে। তিন পর্ব ধরেই তার নাম "ঞ"।'

বলাই বাহুল্য বাংলা ভাষা নিয়ে এ রকম উচ্চমার্গীয় আলাপ হচ্ছিল আমার অফিসেই। আলোচক দু'জনেই ইংরেজিতে মাস্টার্স করে এখন বেকার। হঠাৎ কেন বাংলা ভাষা নিয়ে পড়লাম সে গল্পে পরে আসছি তার আগে একটা আরবী গল্প বলে নিই। আরবী গল্প মানে মূল গল্পটা আরবী ভাষায় আমি বাংলায় ভাবানুবাদ করছি মাত্র।

ধর্মীয় ওয়াজ হচ্ছে। ওয়াজের একদিকে বসেছে নারীরা মানে স্ত্রীরা আরেক দিকে স্বামীরা মানে পুরুষরা। তো বয়ান করছিলেন এক মৌলানা। তিনি বলছিলেন–

" যে পুরুষ পৃথিবীতে সৎ থাকবে সৎ জীবন যাপন করবে সে বেহেস্তবাসী হবে এবং সেখানে তাকে সত্তর জন হুর পরী সঙ্গ দান করবে।"

বয়ানের এই পর্যায়ে এক নারী উঠে বললেন–

'আর একজন নারী যদি পৃথিবীতে সৎ জীবন যাপন করে?'

' সে ক্ষেত্রে সেই নারী স্বর্গে তার নিজের স্বামীকে ফিরে পাবে।'

'ওফ সেখানেও ঐ মিনশে জ্বালাবে।' বলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ঐ মহিলা। তবে আমার ধারনা আরবী এই ব্যাঙ্গধর্মী গল্পটির বাস্তব প্রয়োগটা হবে ভিন্ন রকম–

যেমন ধরুন এ রকম–

এক মহিলা সারা জীবন পৃথিবীতে সৎ জীবন যাপন করলেন।

একদিন মারা গেলেন, যথারীতি তাকে স্বর্গে নেয়া হল। সই বয়ানের নিয়মানুযায়ী তিনি তার প্রিয়তমা স্বামীকে ফিরে পাওয়ার দাবি জানালেন।

'হ্যাঁ অবশ্যই তুমি তোমার স্বামীকে ফিরে পাবে অপেক্ষা করো।'

কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো লাভ হল না তার স্বামীর কোনো খবর নেই।

'কি হল আমার স্বামী কোথায়?' অস্থির স্ত্রী জানতে চাইল।

'একটু মুশকিল হয়েছে।'

'কি মুশকিল?'

' তোমার স্বামীও তোমার মতো পৃথিবীতে সৎ জীবন যাপন করেছিলেন বলে তাকে সত্তর জন হুর পরী দেয়া হয়েছে। এখন তিনি ঐ হুর পরী ছেড়ে তোমার কাছে আসতে চাচ্ছেন না!'

স্ত্রীদের বান্ধবী..

মাঝে মাঝেই আমার স্ত্রীর এক বান্ধবী ফোন করেন যখন আমি ফোন ধরি তখন নিম্নরূপ কথাবার্তা হয়–

'হ্যালো আহসান ভাই? কেমন আছেন?'

'ভালো, তুমি ভালো? ওকে দেব?'

'হ্যাঁ।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীকে ডেকে দেই। এই রকমই চলছিল। তো একদিন আমার স্ত্রী বলল, 'তুমি আমার বান্ধবীর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বললেই পার, ও বলছিল তুমি ফোনে নাকি খুব চাঁছাছোলা। কখন আমারকে ফোনটা দিয়ে বাঁচবে এমন ভঙ্গি করো?

আমি ভাবলাম ঠিক আছে এরপর ফোন করলে একটু রং ঢং করতে হবে স্ত্রীর গ্রীন সিগন্যাল যখন পাওয়া গেছে মন্দ কি?

তো সত্যি সত্যি বেশ কিছু দিন পর সেই বান্ধবীর ফোন। ধরলাম আমিই।

'হ্যালো আহসান ভাই?'

'হ্যাঁ, আরে কি খবর তোমার? তারপর কেমন চলছে?'

'হ্যাঁ, ইয়ে মানে...'

'তারপর তোমার সাহেব কেমন আছেন? আচ্ছা তোমাদের বিয়ের কত বছর হল বলতো? প্রেমের বিয়ে ছিল না?'

আমার ব্রেনে তখন জটিল ক্যালকুলেশন চলছে কি করে কথাবার্তায় অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে একটু রং ঢং করা যায়, যাতে পরে, আমি 'চাঁছাছোলা' এ বদনাম আর আমাকে পেতে না হয়! কিন্তু আমার মনে হল ঐ প্রান্ত থেকে ঠিক ততটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না... শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে স্ত্রীকে ডেকে দিলাম!

পরে স্ত্রী আমাকে এক চোট নিল। তার বান্ধবীর বাবা মারা গেছেন। সেই খবরটা দেওয়ার জন্যই নাকি সে ফোন করেছিল, আর আমি কি সব 'ফ্যাদরা প্যাঁচাল' পেড়েছি তার সাথে!

এই ঘটনার পর থেকে আমি স্ত্রীর বান্ধবীদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলি।

এবার এক লোকের ঘটনা বলি। ঐ লোকের স্ত্রীর বান্ধবীরা বাসায় এলেই লোকটি ড্রইংরুমে ওদের চারপাশে ঘুর ঘুর করত। তো স্ত্রীর বান্ধবীরা ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না বলে একদিন আকার-ইঙ্গিতে ব্যাপারটা লোকটির স্ত্রীকে মানে তাদের বান্ধবীকে জানিয়ে দেয়। যথারীতি স্ত্রীও তার স্বামীকে হুশিয়ার করে দেয়।

' দেখ আমার বান্ধবীরা এ বাসায় বেড়াতে এলেই তুমি ওদের চারপাশে ঘুর ঘুর করবে না, খবরদার!'

'তাহলে কি করব?' নিরীহ মুখে স্বামী জানতে চায়।

'কি করবে না করবে সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু ওরা এ বাসায় এলে তুমি ঘুর ঘুর করবে না।'

'বেশ!'

কিন্তু ক'দিন পর স্ত্রীর বান্ধবীরা ফোন করে স্ত্রীকে মানে তাদের বান্ধবীকে জানাল, ' তোর বর আগে তোর বাসায় আমরা গেলে আমাদের চারপাশে ঘুর ঘুর করত, সেটাই ভালো ছিল রে।'

'কেন? কেন?'

'এখন যে আমাদের প্রত্যেকের বাসায় আলাদা আলাদাভাবে ঘুর ঘুর করা শুরু করেছে।'

নামের মাহাত্ম্য

ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে একটা শ্রেণী বি. বাড়িয়া বলে। মুসলিম প্রধান দেশে হিন্দু নাম থাকবে এটা বোধহয় তাদের সহ্য হয় না। ধরে নিলাম এক শ্রেণীর মৌলবাদীদের এটা একটা চিকন ষড়যন্ত্র! কিন্তু বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে বি চৌধুরী বলার যুক্তি কি! একজন অবশ্য মন্তব্য করল একজন সম্মানিত চিকিৎসকের নামের আগে বদ শব্দটা থাকবে এটা এড়ানোর জন্যই বোধহয় ঐ সংক্ষিপ্তকরণ। আসলে নাম রাখার ব্যাপারে আমাদের আরো সাবধান হওয়া দরকার। ছোটবেলায় আবেগে বাবা-মা তাদের সন্তানদের এমন সব নাম রাখেন যে পরে বড় হয়ে যেন বিপদে পড়তে না হয়। যেমন একটা বিদেশী ঘটনা শুনেছিলাম, এক বাবা ঠাট্টা করে তার ছেলের নাম রেখেছিল, 'কাউডাং' সেই ছেলে বড় হয়ে বাবার নামে কেস করে দিল, পরে তো বাবার আক্ষরিক অর্থেই লেজে গোবরে অবস্থা।

আমাদের দেশে এক বাবা-মা তার কন্যা সন্তানের নাম রেখেছিল 'চুম্বন' সেই শিশু কন্যা একদিন তরুণী হল তার পরের ইতিহাস আর এখানে না লেখাই উত্তম। সেই তরুণী তার বাবা-মার বিরুদ্ধে কেস করেছিল কিনা তা অবশ্য জানা যায় নি।

নাম নিয়ে যে দেশের মধ্যেই ভেজাল হয় তা না, দেশের বাইরে যেতেও ভেজাল কম হয় না। যেমন ২০০৫ এর ডিভি ফরম ফিলাপ করে সবাই উম্মাদের মতো পাঠাচ্ছে। শুধু দেখেছি আশফাক নামের লোকজন মানে যাদের নামের মধ্যে আশফাক শব্দটি আছে তাদের ডিভি ফরম পুরণে বিশেস আগ্রহ নেই। কেন নেই তা আশা করি ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নেই। মোল্লা বংশের একজনকে চিনি যে ব্যক্তিগত জীবনে খুবই আধুনিক। কিন্তু তার বাবা ঐ শব্দটি নামের আগে পার্মানেন্টলি বসিয়ে দেয়ায় বেচারার আমেরিকা যাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আমেরিকা যাওয়া তার খুবই দরকার। তার স্ত্রী যে ঐখানেই থাকেন! টেলিফোনে বিয়ে! এখন তিনি কিছু দিন পর পর ভিসা অফিসে যান ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কে জানে ভিসা অফিসের মোটা মাথা লোকজনের ধারনা তিনি বোধহয় মোল্লা ওমরের ফার্স্ট কাজিন।

সব নামেই যে বিপদ তা নয়। কিছু নামে আবার সুবিধাও আছে। যেমন ১৯৭১ সালের সেই বিখ্যাত গল্প। বিহারী লাল নামের এক হিন্দু ভদ্রলোককে পাকিস্তানি আর্মি ধরে নিয়ে গেল গুলি করে মারতে। পরে শুনল সে বিহারী (মানে তার নাম) সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ!

নাম নিয়ে সবচে কমন জোকসটা তো বোধহয় সবারই জানা। সেই যে একজন পাঁচ কড়ি দত্তকে ডেকে আনতে গিয়ে পাঁচ কড়িকে না পেয়ে দুই কড়ি আর তিন কড়ি দত্তকে নিয়ে হাজির। সেই লোককেই এবার পাঠান হল আট কড়ি দত্তকে ডেকে আনতে। বাই দিস টাইম পাঁচ কড়ি দত্ত ডিভি লটারীতে আমেরিকা প্রবাসী। তিন কড়ি মারা গেছে, দুই কড়িও এলাকায় নেই! ডেকে আনতে যাওয়া লোকটি কি করবে আট কড়িকে না পেয়ে এলাকার নিঃসন্তান একজনকে ধরে বেধে নিয়ে গেল।

'একি একে এনেছ কেন? এতো আট কড়ি নয়?'

'আট কড়িকে পাই নি তাই একে আনছি, এ আটকুরা!'

গিফট যখন নারকেল

এ বছর হ্যাপি নিউ ইয়ারে এক পার্টিতে গিয়েছিলাম। পার্টিটা একটা বাসায়। বিশাল এক কেক আনা হয়েছে। বারোটা এক মিনিটে কেক কাটা হবে। সবাই অপেক্ষামান। বারোটা বাজল, বাড়ির কর্তা কেক কাটলেন আর কি আশ্চর্য কেকটা গান গেলে উঠল, 'হ্যাপি নিউ ইয়ার... 'সবাই অবাক, 'বাহ! কেক কথা বলে এমন কেক তো আগে দেখিনি, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই কেক আর কেউ খেতে চায় না। কেকের টুকরো পেটের ভিতরে গিয়েও যদি গান গাইতেই থাকে তাহলে তো বিপদ! টুকরো টুকরো করে কাটা কেক অবশ্য তখনো গান গেয়েই চলেছে... পার্টি শেষে আমি বাড়ির কর্তাকে ঐ কেকের গান গাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করতেই, তিনি মুচকি হেসে বললেন–

'গান কিন্তু আসলে কেক গায় নি।'

'তাহলে?'

'গান গেয়েছে ছুরিটা।'

পরে বোঝা গেল ছুরিটা বিশেষভাবে তৈরি। নানান অপশন আছে তাতে। হ্যাপি নিউ ইয়ারে কেক কাটলে 'হ্যাপি নিউ ইয়ারের গান গেয়ে ওঠে' আবার জন্মাদিনের কেক কাটলে গেয়ে ওঠে, 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইয়্যু'। আমি তখন জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা ঐ ছুরি দিয়ে যদি মৌলবাদীরা রগ কাটে তাহলে কি গাইবে?'

আমার প্রশ্ন শুনে মি. হোস্ট অগ্নি দৃষ্টি হেনে শটকে পড়লেন। আমিও কেটে পড়লাম।

ইদানিং হ্যাপি নিউ ইয়ারে গিফট, কার্ড ইত্যাদি দেয়া নেয়ার একটা চল হয়েছে। বাজারে গিফট শপেরেও কোনো অভাব নেই। নানান সব সুন্দর সুন্দর গিফট আইটেম আছে। কিন্তু কেউ কি কখনো শুনেছেন হ্যাপি নিউ ইয়ারে বছরের পর বছর নারকেল গিফট করতে? এমনি এক ঘটনাই ঘটেছ সাগরের এক দ্বীপে। জাহাজ ডুবিতে এক দম্পত্তি কোনো রকমে সাঁতরে এসে উঠল এক

দ্বীপে। সেই দ্বীপে একটি মাত্র নারকেল গাছ। কাজেই তাদের নতুন জীবনে স্ত্রীর জন্মদিন, ম্যারেজ ডে, কিংবা হ্যাপি নিউ ইয়ারে স্বামী বেচারা স্ত্রীকে শুধু নারকেল গিফট করে! তো প্রতি বছর নারকেল উপহার পেতে পেতে একদিন স্ত্রী বিদ্রোহ করে, বসল, 'এ বছরে যদি তুমি নারকেল গিফট করো আমি সাগরে ঝাপিয়ে আত্মহত্যা করব', শুনে হতাশ স্বামী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভাগ্যের কি খেলা ৩১ শে ডিসেম্বর ঐ দ্বীপে ভেসে এল একটা সুন্দর বোতল। স্বামী বেচারা মহা খুশি এবার স্ত্রীকে আর নারকেল গিফট করতে হবে না।

যা হোক নুতন বছরে বোতল পেয়ে স্ত্রীও মহা খুশি। বোতলের ছিপি খুলতেই ফুর ফুর করে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল। যথারীতি এক ভীষণ দর্শন জ্বীন বেরিয়ে এল–

'হুকুম করুন মালিক।'

'আ-আমাদেরকে জলদি লোকালয়ে পৌছে দাও।'

'সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'আমি সামুদ্রিক জ্বীন। আমি এক দ্বীপ থেকে বড় জোর আরেক দ্বীপে নিয়ে যেতে পারি। লোকালয় আমার এক্তিয়ারের বাইরে।'

'বেশ তাই করো, অন্য কোনো দ্বীপে নিয়ে যাও।'

তাদেরকে খুব শীঘ্রি নতুন একটা দ্বীপে নেয়া হল। বলাই বাহুল্য আগের দ্বীপে ছিল একটি মাত্র নারকেল গাছ, এই দ্বীপে বারোটি!

মরনরে তহু মম...

পনেরজন সেনা কর্মকর্তা বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। খুবই মর্মান্তিক একটি ঘটনা। জাতীয় ভাবে একদিন শোক দিবস গোষণা করা হল। আর এই শোক দিবসের ঘটনাটি পড়েই এক তরুণ কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল একটি অংক করতে। পাশেই ছিল তার এক বন্ধু, সে জিজ্ঞেস করল–

'কিরে, কি করছিস?'

'অংক করছি।'

'কি অংক?'

'একটা ঐকিক নিয়মের অংক।'

'আরে পাটিগণিত থেকে ঐকিক নিয়মের অংকতো সেই কবেই উঠে গেছে!'

'তাতে কি, জাতির কোনো কোনো সন্ধিক্ষনে সেই ঐকিক নিয়মের অংক কখনো কখনো আবার দরকার হয়ে পড়ে। যেমন এখন হয়েছে।'

'তা ঐকিক নিয়মে তুই কি বের করার চেষ্টা করছিস?'

'আমি বের করার চেষ্টা করছি... পনেরো জন সেনা কর্মকর্তা বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলে জাতীয়ভাবে একদিন শোক দিবস হলে চারশজন সাধারণ মানুষ লঞ্চ দুর্ঘটনায় মারা গেলে কত দিন জাতীয় শোক দিবস হওয়া উচিৎ ছিল?'

মানুষের কোন মৃত্যুটি বেশি কষ্টের, আগুনে পুড়ে মৃত্যু নাকি পানিতে ডুবে মৃত্যু? সব মৃত্যুই কষ্টের। আর এ জন্যই বোধহয় মানুষের মৃত্যু ভয় প্রবল। অবশ্য কিছু কিছু বীর শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা মৃত্যুকে তাদের জীবনে তোয়াক্কা করেন নি। তাদের সংখ্যা নগণ্য, তবে একজনকে পাওয়া গেছে যে বীর টির কিছু নয়। সাধারণ মানুষ, তারপরও তার মৃত্যু ভয় নেই।

' সেকি আপনার মৃত্যু ভয় নেই?'

'না।'

' কেন?'

'কারণ আমার মৃত্যু নেই।'

'মানে?'

'মানে আমার নাম অমর নাথ!'

এটা অবশ্য নিছকই একটা ঠাট্টা। মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা করা উচিৎ নয়। তারপরও ঠাট্টা না করে পারছি না।

এক লোক ঠিক করল মৃত্যু ব্যাপারটাকে সামনে রেখে জীবন যাপন করা তার জন্য কষ্টকর। সে ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল সে মৃত্যু ব্যাপারটিকে আগে ভাগে চুকিয়ে ফেলে জীবন শুরু করতে চায়। ঈশ্বর বললেন–

'এটা কি করে সম্ভব? জন্ম হবে তারপর না মৃত্যু।'

' হে ইশ্বর আমি এসব বুজি না, আপনি সব পারেন আপনি অন্তত একটি ক্ষেত্রে মানে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টে দিন। আমি মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি আগে ঘটিয়ে রাখতে চাই। তারপর জন্মাব। ঈশ্বর ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে।'

ধরা যাক এই লোকটির নামই অমর নাথ। ইশ্বর তাকে সৃষ্টি করলেন মৃত্যু দিয়ে। সে এখন আর মরবে না। কখনোই মরবে না। অমর শুধু জন্মাবে! কিন্তু অচিরেই দেখা গেল এ ব্যাটা ক্রমে ক্রমেই হয়ে উঠল এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী। সে যেহেতু জানে তার মৃত্যু নেই, সেহেতু হেন অপর্কম নেই যা সে না করল। ইশ্বর দেখলেন এতো মহাবিপদ হল দেখছি! এখন একে মারাও যাচ্ছে না যেহেতু তার মৃত্যু আগেই হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ইশ্বর তাকে ডেকে পাঠালেন–

'তুমি যা শুরু করেছ তাতে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না।'

'কিন্তু আমি তো অমর, আমার মৃত্যু আগেই হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার জন্ম সামনে তোমাকে আবার জন্মাতে হবে।'

'তাতে আপত্তি নেই, মৃত্যু না হলেই হল।'

অবশেষে যেহেতু তার মৃত্যু নেই। তাকে তিনি আবার জন্মালেন। অমর নাথ এবার জন্মাল নরকে, একখানেও সে মৃত্যুহীন। অমর।

মৃত্যু নিয়ে একটা চমৎকার বাক্য না লিখলেই নয়। বাক্যটির উৎস অবশ্য অজানা–

"কবরের চারপাশে বেড়া দেবার মতো বোকামি আর নেই। কারণ যারা কবরের ভিতরে তারা কখনোই বাইরে আসতে পারবে না, আর যারা বাইরে তারা কেউই ভিতরে যেতে চায় না।'

চোখের ভাষা

বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। এটা একবার বলেছি। ভাষা নিয়ে আরো কিছু বলা যেতে পারে মানে বাংলা ভাষা নিয়ে। যেমন সেদিন একটা মজার কথা শুনলাম যেমন বাংলা ভাষা নাকি প্রথম বাধাগ্রস্থ হয় নোয়াখালিতে, তারপর আহত হয় সিলেটে এবং অবশেষে নিহত হয় চট্টগ্রামে। তবে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত আবুল ফজল কি একটা প্রসঙ্গে নিজেই একবার বলেছিলেন–

"বাংলা ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রামের ভাষার সামান্য কিছু মিল আছে।"

আমি যেহেতু কোনো ক্রমেই ভাষাবিদ নই, সেহেতু ভাষা নিয়ে বেশি স্পর্ধা দেখান উচিৎ নয়। তবে যেহেতু নিজের মাতৃভাষা তখন একটু ফান করতে দোষ কি? বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর মধ্যে সবচে সুন্দর ভাষা হচ্ছে কুষ্টিয়া এলাকার ভাষা। খুবই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন তারা। তো একদিন গুলিস্তান থেকে বাসে উঠেছি মিরপুর যাব। বাসের মধ্যে হঠাৎ করে এক তরুণ উঠল। তার গলার স্বর কান্না কান্না, সে বলতে শুরু করল, সে কুষ্টিয়া থেকে এসেছে ঢাকায় চাকরি বাকরীর আশায়। এসে যেখানে উঠবে সে ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। টাকা পয়সাও পকেট মার গেছে। এখন সে কুষ্টিয়ায় ফিরে যেতে চায়। বাসের ভাড়া হলেই ফিরে যাবে... ইত্যাদি ইত্যাদি। তার কথায় অনেকেই দেখলাম দু'এক টাকা করে দিল। দিব্যি বেশ কামিয়ে নেমে গেল সে। হয়তো পরবর্তী কোনো বাসে উঠবে। আর ঠিক তখন আমার মাথায় ক্লিক করল, আরে এতো মহা চীট করল আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ! কিভাবে? সে বাসে যতক্ষণ কথা বলেছে, পরিস্কার বরিশালের ভাষায় কথা বলেছে! তার বাড়ি আসলে বরিশাল! আমরা কেউই খেয়াল করলাম না!

বরিশালের প্রসঙ্গই যখন আসল একটা গল্প এখানে না বললেই নয়! গল্পটা বলেছেন আমার এক বরিশালের বন্ধু। গল্পটা একটু 'ইয়ে' আছে। এক কঠিন রাজনীতিবিদ। বাড়ি যেহেতু বরিশাল, তিনি বক্তৃতাও করেন বরিশালের ভাষায়। তো একবার তিনি বক্তব্য রাখছিলেন এক জনসমাবেশে।

'ঐ মিয়ারা বাংলাদেশ জাগবে কবে? নেপাল জাগছে, বার্মা জাগছে, ভারত তো জাইগাই রইছে, বাংলাদেশ জাগবে কবে...?'

আশা করছি ইতোমধ্যেই আপনারা বুঝে গেছেন কোন গল্পটি আমি বলতে যাচ্ছিলাম! বরং অন্য গল্প শোনা যাক–অন্য ভাষার গল্প এ গল্পের শুরুটা অবশ্য সবার জানা—সেই যে এক ছাত্রী তার হোম টিউটরের প্রেমে পড়ে গেল। তো একদিন আবেগ-বিহ্বল গলায় বলল,

'স্যার আপনি কি আমার চোখের ভাষাও বোঝেন না?'

স্যার খিঁচিয়ে উঠলেন, 'রাখ তোমার চোখের ভাষা। হাতের লেখাই বুঝি না।'

তো শেষ পর্যন্ত সেই স্যারের সঙ্গেই ছাত্রীর বিয়ে হল। বাসর রাত এবার স্যারের বলার পালা।

'মলি আমার চোখের দিকে তাকাও... দেখ সেখানে তোমাকে নিয়ে আমার কত স্বপ্ন বাসা বেধেছে...'

এবার ছাত্রী মানে নববধূ খিঁচিয়ে উঠল, 'রাখ চোখের স্বপ্ন! জলদি একটা চাকরি জোগাড় কর আগে, দুঃস্বপ্নেতো রাতে আমার ঘুম আসবে বলে মনে হয় না।'

মাতাল বাঙ্গালী

থার্টি ফার্স্টে হঠাৎ করে ' ভেতো বাঙ্গালী' যেন ' মেদো বাঙ্গালী' হয়ে ওঠে। মানে ভাত খাওয়া বাঙ্গালীর গলা 'শুক্যে' ওঠে বিশেষ তরল পানিয়ের জন্য। সন্ধ্যার পর থেকেই যেন কোনো তরুণকেই এ ঘরে আটকে রাখা যায় না। বেশির ভাগ তরুণরাই খোঁজে থাকে কে কোন পার্টিতে যাবে! বিনা পয়সায় মদ খাবে। বিনা পয়সার মদে যতটা নেশা হয় নিজের পয়সায় কেনা মদে অতটা হয় না। অতএব খোঁজ খোঁজ খোঁজ... কোথায় কোন পার্টি হচ্ছে! এমনি এক তরুণ প্রতি বছর গন্ধ শুকে শুকে বিভিন্ন পার্টিতে গিয়ে হাজির হয়। এ বছর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু যখন প্রশ্ন করল–

' কোন পার্টিতে যাচ্ছিস এ বছর?'

' কোনো পার্টিতে যাচ্ছি না। বাসাতেই থাকব।'

'বলিস কি, কেন?'

বন্ধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কিছু বলল না। পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর চাপাচাপিতে ঘটনা খুলে বলল, কেন এ বছর যাচ্ছে না। গত বছর যখন সে একটা পার্টিতে যাচ্ছিল তখন রাস্তায় টহল পুলিশ আটকায়–

'কই যাও?'

'বন্ধুর বাসায়।'

'এত রাতে কেন? থার্টি ফার্স্ট করতে?'

ছেলেটি কিছু বলে না, ওদিকে আরেক পুলিশ তাকে সার্চ করতে শুরু করেছে। পকেটে সন্দেহজনক কিছু নেই মানি ব্যাগে ৫০ টাকার একটা নোট। পুলিশ এই অবস্থা দেখে খিচিয়ে উঠল–

'ফকিন্নির পুত! ৫০ টাকা দিয়া থার্টি ফার্স্টস করতে বাইর হইস? গেলি।'

অত্যন্ত অপমানিত সেই তরুণ এর পরপরই সিদ্ধান্ত নেয় আর কোনো বছরই সে পার্টিতে যাবে না, মাতাল হবে না। তো সে মাতাল না হলেও রাত দুটার দিকে অন্য দুই তরুণ পার্টি শেষ করে পাড় মাতাল হয়ে বেরুল।

টলটলায়মান অবস্থায় দু'জনে হেঁটে চলেছে। অন্ধকার রাস্তা, ভাগ্যে একজনের হাতে টর্চ ছিল। সেটা জ্বেলে কোনো মতে পথ চলেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, দু'জনেরই মেজাজ ফুর ফুরে। আকাশে একটা ঝকঝকে চাঁদও উঠেছে! একজন বলল–

' দোস চাঁদটা দেখেছিস? ইচ্ছে হচ্ছে ঐ চাঁদটায় উড়ে চলে যাই।'

'যা না, অসুবিধা কি?'

'কিন্তু যাব কিভাবে?'

'আমি টর্চটা জ্বেলে ধরছি চাঁদের দিকে, তুই বেয়ে উঠে যা না।'

'এহ্ মাঝপথে টর্চের সুইচ বন্ধ করে দিবি তখন আমি মাটিতে আছড়ে পড়ে মরি আর কি।'

'না না সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'আমি টর্চের সুইচটা পার্টিতে ফেলে এসেছি ভুলে।'

মাতালরা কেন মদ খায় কারণটা খুব সহজ, মদ না খেলে যে তারা মাতাল হতে পারে না!

মিথ্যা উপদেশ

বাংলা ভাষায় একটি শব্দ আমার অপছন্দ তার মধ্যে একটা শব্দ হচ্ছে ' বেহুদা'। সেদিন দেখি কোন একটি দৈনিকে একটা হেডিং 'হুদার বেহুদা উক্তি'। পাঠককে নিশ্চয়ই নতুন করে আর বলার নেই তিনি কি বেহুদা উক্তি করেছেন। তার 'চুম্বক ট্রেন দর্শন' এর পর এটি দ্বিতীয় দর্শন! এই দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তার দলেরই আরেক তরুণ এম. পি তার পদত্যাগ দাবি করেছেন। দলে নাকি এ ধরনের লোক থাকা বিপদজনক!

এ প্রসঙ্গে রাজা ফ্রেড্রিক-এর একটি গল্প শোনা যেতে পারে। ষোড়শ শতকের ঘটনা, রাজা ফ্রেড্রিক একবার গেছেন জেল পরিদর্শনে। ঘুরে ঘুরে কয়েদীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনছিলেন। সবাই তাকে জানাল যে সে আসলে নির্দোষ। অন্যায়ভাবে তাকে বন্দি করে আনা হয়েছে... ইত্যাদি ইত্যাদি। জেলখানার ভিতর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একজন কয়েদীকে পেলেন একটু অন্যরকম।

'তুমিও নির্দোষ নাকি?' ফ্রেড্রিক জানতে চাইলেন।

'না, জাহাঁপনা।'

'তুমি তাহলে দোষি মনে কর নিজেকে?'

'জ্বী জাঁহাপনা, আমি অপরাধ করেছি, আমি সাজা পাওয়ার যোগ্য।'

তখন সম্রাট ফ্রেড্রিক ক্ষেপে গেলেন। জেলারকে ডেকে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'অন্যান্য নির্দোষ লোকগুলোকে খারাপ করার আগেই তুমি এই বদমাশটাকে জেলখানা থেকে বের করে দাও!'

ঐতিহাসিক গল্পের পর একটা সাম্প্রতিক (তাও বছর পাঁচেক আগের) গল্প শোনা যাক। ঢাকা শহরের ইংলিশ রোডের ব্রোথেলে একবার হঠাৎ করে পুলিশ রেইড দেয়। সমস্ত খদ্দেরকে গ্রেফতার করে। পরে খদ্দেরদের বসিয়ে রেখে একজন একজন করে জিজ্ঞেস করা হয় তারা কেন এখানে এসেছে। বেশিরভাগ খদ্দেরই বলে, তারা ভুল করে এখানে ঢুকে পড়েছে... তারা জানত না এখানে ব্রোথেল নারীরা থাকে... ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে গোটা চারেক খদ্দের স্বীকার

করে তারা আসলেই এখানে জৈবিক তাড়নায় এসেছে এবং পুলিশ সেই চারজনকেই তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দেয়।

দেখা যাচ্ছে মিথ্যার চেয়ে সত্য বলায় কখনো কখনো কিছু সুবিধা কিন্তু পাওয়া যায়। আর সে কারণেই বোধহয় এক বিখ্যাত দার্শনিক বলেছিলেন... মানে ব্যাপারটা তিনি কিন্তু একটু কায়দা করে ঘুরিয়েই বলেছিলেন যে ...আর এ কারণেই আমি সব সময় মিথ্যা উপদেশ দিয়ে থাকি, আর এটা তো সবাই মানে মানুষ সবসময় উপদেশের উল্টোটাই করে।'

ইকোনোমি প্রজেক্ট

আমি এক ভদ্রলোককে চিনি, যিনি পরপর তিন সন্তান নিয়েছেন। তিনজনই ছেলে। তো আমি তাকে একদিন বললাম, 'তুমি একজন আধুনিক যুগের লোক হয়ে পর পর কেন তিনটি বাচ্চা নিলে, এটা তো তোমার স্ত্রীর শরীরের জন্যওতো ক্ষতিকর। সে বলল, 'আমি আর আমার স্ত্রী প্ল্যান করেই নিয়েছি।'

'মানে?'

'মানে সোজা, আমরা দু'জন প্ল্যান করেই পর পর তিন বাচ্চা নিয়েছি। যেন একজনের কাপড় পরে অন্যের চলে যাবে, একজনের বই অন্যজনে পড়বে।'

পরে বোঝা গেল তার ইকোনোমি চিন্তা। তাদের প্ল্যান হচ্ছে তারা শুধু বড় জনের জামা জুতা কিনবে এবং পরের বছর বড়র জামা মেঝোজন পরবে মেঝো জন-এর জামা ছোটটা পরবে। এমনকি তারা যখন স্কুলে পরবে তখন পাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে, শুধু বড় জনের পাঠ্য বই কিনলেই হবে। আমি দেখলাম বুদ্ধি খারাপ নয়। যথেষ্ট ইকোনোমিক চিন্তা। কিন্তু পরে শুনেছি ঐ পরিবারে বিরাট ঝামেলা হয়েছে। ঐ তিন ক্রমিক পুত্র যখন ছোট ছিল তখন সমস্যা হয় নি, কিন্তু ওরা যখন বড় হল মানে যে বয়েসে ছেলেরা পোষাক-আশাকে একটু 'ভাঁজ' মারতে চায় সেই বয়সে পৌঁছাল, তখনই শুরু হল সমস্যা। ছোট দুই ভাই পুরানো কাপড় পরতে আর রাজি নয়। ছোটটা মেঝোটার পরতে রাজি নয়, মেঝোটা বড়টার পরতে রাজি নয়। ব্যাপারটা ইকোনোমি বাবা-মারা কানে গেল। বাবা-মা ঐ দুজনকে ডেকে কড়া ধমক দিলেন। তারা তাদের 'ইকোনোমি চাইল্ড প্রজেক্ট' এর নিয়ম কানুন ভাংতে রাজি নন। ক'দিন পর ঘটল আরেক দুর্ঘটনা, ছোট আর মেঝো মিলে বড়টাকে আচ্ছাসে পিটিয়ে দিল। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বড়জন হাসপাতালে না থাকলেও বিছানায় শোয়া, ছোট দু'জন পলাতক। অবশ্য পালিয়ে বেশি দূর যেতে পারে নি, নানা বাড়িতেই আত্মগোপন করেছে তারা।

বহু.বছর বাদে সেই ইকোনোমি চাইল্ড প্রজেক্টের বাবার সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ দেখা—

'কি হে তোমার ছেলেরা কে কেমন আছে?'

'বড়টা তো ব্যাংকে ছিল, তো ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে একটা এনজিওতে ঢুকেছে।'

' মেঝোটা?'

'ও তো ব্যবসা করত... হঠাৎ একটা প্রাইভেট ব্যাংকে ভালো সুযোগ পেয়ে ঢুকে পড়েছে।'

' ছোটটা?'

'ওটাকে নিয়েই চিন্তাই আছি। কিছু করে না তবে আপাতত মেঝো'র ব্যবসায় ওকে ঢুকিয়ে দিয়েছি... বেকার বসে না থেকে লেগে থাকুক কি বলেন?'

আমিও মাথা নেড়ে সায় দেই! 'অবশ্যই লেগে থাকলে যে কোনো বিষয়েই সাফল্য আসতে পারে, হোক না সেটা 'ইকোনোমি চাইল্ড প্রজেক্ট'-এর মতো কোনো প্রকল্প।'

মেলায় যাইরে!

এবার ঢাকা বই মেলায় গিয়ে প্রথমে ভাবলাম হতবাক হই পরে ঠিক করলাম না বরং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই... শেষ পর্যন্ত 'তবদা' লেগে গেলাম (আমি এখনো শিওর না এই শব্দটি বাংলা ভাষায় আছে কিনা) কেন তবদা লাগলাম? মেলায় ঢুকেই দেখি গান হচ্ছে, 'খোদা তোমারি মেহেরবান ...' ভাবলাম বোধয় ভুল করে ইসলামিক গান ছেড়েছে। পরে দেখলাম না একের পর এক ইসলামিক গান হচ্ছে। আমার একবার সন্দেহ হল, তবে কি আমি ভুল করে ঢাকা মেলায় না এসে বায়তুল মোকাররম সংলগ্ন ইসলামিক বই মেলায় ঢুকেছি? আমার ধারনা আর দৃঢ় হল, যখন দেখি কামিয়াব নামে এক স্টলে গোলাম আযমের সচিত্র বই বিক্রি হচ্ছে। আমি আমার সঙ্গে আসা রম্য লেখক সাজ্জাদ কবীরকে জিজ্ঞেস করলাম–

'আপনি সিওর আমরা ঢাকা মেলায় এসেছি?'

'এ্যাঁ... ইয়ে তাই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু...'

এ সময় ইসলামিক গান বন্ধ হয়ে তখন বইয়ের প্রচার শুরু হল। প্রথম বইটির নাম 'পাক সার জামিন সাদবাদ' (পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গিত) বইটি যদিও রাজাকার বিরোধী লেখা বলেই শুনেছি, কিন্তু সিচ্যুয়েশন এমন দাঁড়াল যে আমি যেন পাকিস্তানের কোনো বই মেলায়!

যা হোক মেলা কোনো মতে ঘুরে ফিরে বাইরে এসেছি। বাইরে তখন প্রচণ্ড শীত। দেখি এক বয়স্ক লোক কিছু সাদা কালো ক্যালেন্ডার বিক্রি করছেন। ক্যালেন্ডারগুলোতে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি। আমি একটি ক্যালেন্ডার কিনলাম। সাজ্জাদও কিনল। বিক্রেতা খুব খুশি হলেন মনে হল বেধাহয় আমরাই তার প্রথম ক্রেতা। কথা প্রসঙ্গে বিক্রেতা জানালেন তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আমরা ভাবলাম সেটাই স্বাভাবিক, নইলে এই মেলার বাইরে জবুথবু হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কেনইবা এই ক্যালেন্ডার বেচবেন তিনি?

এখন অবশ্য মেলার সিজন চলছে। বাণিজ্য মেলা, বই মেলা, কম্পিউটার মেলা সব মেলা এক সঙ্গে যেন সেশনজট লাগিয়ে দিয়েছে! সন্ধ্যার পর যাকেই

ফোন করি সেই দেখি মেলায়। একদল মেলায় যাচ্ছে, একদল যাচ্ছে না। ব্যাপারটা মোবাইল ফোনের নেট ওয়ার্কে চিন্তা করলে এমন দাঁড়ায়...

'কিরে তুই কোথায়?'

'আমি তো মেলায়।'

' কোন মেলায়?'

'বই মেলা শেষ করে বাণিজ্য মেলায় ঢুকেছি, আসবি নাকি?'

'না, আমিও আরেক মেলায়।'

'কোন মেলায়? কম্পিউটার মেলায়?'

'না, আমি আছি "ঝামেলায়"।'

ইন্ডিয়ান জোকস্

আমার সাত বছরের ভাগ্নি তিথির ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। সম্ভবত পরদিন বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা। সে উচ্চ স্বরে, 'পাট বাংলাদেশের সোনালী আঁশ' রচনা পড়ছে। এক জায়গায় দেখি সে পড়ছে এভাবে... 'পাট বাংলাদেশ, ভারত, "থুঃ" থাইল্যান্ড ও বার্মার বেশি জন্মায়...' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–

'ওটা কি পড়লে?'

' কোনটা?'

'ঐ যে থুঃ বললে।'

'ওখানে পাকিস্তান লেখা যে!'

আমি তো অবাক। বললাম, 'তুমি কি পরীক্ষাতেও 'থুঃ' লিখবে নাকি?

'না পরীক্ষাতে ঠিক লিখব। তবে পড়ার সময় আমি এভাবেই পড়ি। বলে সে আবার উচ্চস্বরে রচনা মুখস্ত করতে লেগে গেল। 'পাট বাংলাদেশে সোনালি আঁশ... এ্যাঁ এ্যাঁ... পাট বাংলাদেশের সোনালি আঁশ...।

অবশ্য পাট আর নাকি বাংলাদেশের সোনালি আঁশ নেই। এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাদামি বাঁশ। তবে বাঁশ কিন্তু এখনো বাঁশই আছে। ইদানিং এক একটি বাঁশের যা দাম আমার এক বন্ধুর কাছে শুনে তো আমার চক্ষুস্থির! শুধু তাই নয়, সেদিন এক চায়নিজের দাওয়াতে 'বেম্বু স্যুপ' খেতে গিয়ে মেন্যুতে স্যুপের দাম দেখে আমার আবারও চক্ষুস্থির... না এবার আর স্থির নয়। বলা উচিৎ অস্থির!

পাকিস্তান প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমার ভাগ্নির যেমন ঘৃণা জন্মেছে পাকিস্তানের প্রতি এই বয়সেই। এই রকম এক তরুণকে নিয়ে আমি গেলাম একবার এক ফার্স্ট ফুডের দোকানে ঠাণ্ডা কিছু খেতে।

'ঠাণ্ডা কিছু আছে?'

'জুস আছে।'

'কি জুস?'

'সেজান, পাকিস্তানের জুস।'

দোকানদার 'পাকিস্তান' শব্দটির প্রতি বিশেষ জোর দিল যেন। আমার সঙ্গের তরুণটি বলল, 'না পাকিস্তানের জুস খাই না।'

দোকানদার সেজান জুস বের করে ফেলেছিল। 'খাই না' শুনে ফ্রিজ রাখতে রাখতে বিড় বিড় করে অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরেই বলল–

'আপনের মতো দু' একজন কাস্টমার ৭১ সালে থাকলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে নয় মাসও লাগত না।'

আমার সঙ্গের তরুণটি দেরি করল না। খুব চমৎকার একটি চড় কষাল দোকানদারের গালে! চড়ের শব্দটা হল চমৎকার। অন্যান্য কাস্টমাররা সবাই ঘুরে তাকাল ঘটনার দিকে। হতভম্ব দোকানদার কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

এবার একটা জোকস শোনা যাক, পাকিস্তানীদের নিয়ে ইন্ডিয়ান জোকস!

এক পাকিস্তানীকে একটা থার্মোফ্লাস্ক উপহার দিল একজন ইন্ডিয়ান। পাকিস্তানী বলল, 'এটা কি?'

'এটা থার্মোফ্লাস্ক।'

'এটা দিয়ে কি হয়?'

'এটাতে যদি ঠাণ্ডা জিনিষ রাখ ঠাণ্ডাই থাকবে।'

'আর যদি আমি গরম জিনিষ রাখি?' জানতে চাইল পাকিস্তানী।

'গরম জিনিষ রাখলেও গরম থাকবে।'

'তাই নাকি!'

পাকিস্তানী খুশি মনে থার্মোফ্লাস্কটি গ্রহণ করল। কিন্তু দুদিন পর ফ্লাস্কটি ফেরৎ নিয়ে এল।

'কি হল?' ইন্ডিয়ান জিজ্ঞেস করল।

'তোমার এটা কাজ করে না।'

' কেন কাজ করবে না!'

'আমি গরম চা আর ঠাণ্ডা আইসক্রিম রেখেছিলাম। দেখ তার বদলে এসব কি বেরুচ্ছে!'

দেশপ্রেম নিয়ে ব্রাউডিন এর একটি কোটেশন এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না–"একমাত্র নিজের দেশকেই অন্ধের মতো ভালাবাসা যায়।"

চিরকুমারের শাস্তি

এক চিরকুমার সভায় জরুরি মিটিং ডাকা হয়েছে। সভার সব সদস্যদের মুখ থমথমে। ফিস ফাস চলছে। সবাই অপেক্ষা করছে সভার প্রবীণতম চিরকুমার সদস্যের জন্য। তিনি আসলেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উত্থাপন করা হবে।

কিছুক্ষণ বাদেই এলেন তিনি। তিনিই এই সভার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সভাপতি আসন গ্রহণ করলেন। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুরু করলেন–

'সভাপতি আশা করি ইতোমধ্যে সমস্যাটি আপনি অবগত হয়েছেন।'

' কোন সমস্যাটি বল তো?'

'ঐ যে আমাদের চিরকুমার সভার একজন অন্যতম সদস্য সভার আইন ভঙ্গ করে গত সপ্তাহে বিয়ে করেছে।'

'হুম।'

সভাপতি মুচকি হেসে গম্ভীর হয়ে গেলেন যেন।

'এখন তার কি শাস্তি হওয়া উচিৎ?'

সভায় থমথমে নিরবতা নামল। তাই তো কি শাস্তি হতে পারে?

কেউ বলল, এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হোক। কেউ বলল, সভায় ডেকে এনে নাকে খত দেয়ানো হোক। কেউ বলল, দশবার কান ধরে উঠ বস... ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রবীণ সভাপতি চুপ। তিনি কোনো মন্তব্যই করলেন না। সবাই তার দিকে তাকিয়ে তিনি কি শাস্তির কথা বলেন। অবশেষে তিনি মুখ খুললেন।

'ওর কোনো শাস্তির প্রয়োজন নেই।'

' কেন? কেন?'

সবাই হা হা করে উঠল। তখন সভাপতি মুচকি হেসে বললেন–

'ওর শাস্তির প্রয়োজন নেই। কারণ বিয়েটাই ওর জন্য একটা শাস্তি।'

বাস্তবেই কি চিরকুমার সভার সেই দলছুট চিরকুমারের শাস্তি হয়েছিল? সেটা বুঝতে হলে পাঁচ বছর পর যেতে হবে সেই দম্পত্তির কাছে, দেখি কি শাস্তি চলছে।

সেই দলছুট চিরকুমার, অবশ্য তখন আর কুমার নয়। সে একজনের স্বামী। তো সেই স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে অনেক দিন ধরে কথা বন্ধ। বিছানাও আলাদা।

এক দুপুরে হঠাৎ সেই স্বামী অফিস থেকে ফিরে দেখল স্ত্রী শুয়ে আছে এক যুবকের সাথে। স্বামী রেগেমেগে গালিগালাজ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। স্ত্রী কৈফিয়ৎ দিল–

'আগে আমার কথাটা শোনো। তারপর যা ইচ্ছে হয় করো।'

' শোনার দরকার নেই। যা দেখেছি তাই যথেষ্ট।'

' শোনোই না। আমি দুপুরে খেয়ে একটু শুতে যাচ্ছি, এমন সময় লোকটি এল ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে, এক টুকরো রুটি চাইল। তাকে ঘরে বসিয়ে খাওয়াতে গিয়ে দেখলাম, তার পায়ের জুতো ছেঁড়া। তোমার ব্যবহার না-করা পুরনো জুতো থেকে এক জোড়া তাকে দিলাম। জুতো জোড়াটা দেবার পর দেখলাম, তোমার জুতোর সাথে ওর প্যান্টটা ঠিক মানাচ্ছে না। তখন তোমার পুরনো একটা প্যান্ট। তাকে দিলাম। তারপর দেখলাম, প্যান্ট-জুতো মানালেও ওর ছেঁড়া শার্টটার সঙ্গে সবকিছু বেমানান দেখাচ্ছে। তাই তোমার সেই কবেকার কেনা একটা সার্ট ওকে পরতে দিলাম।'

'কিন্তু ও তোমার বিছানায় কেন?'

' সে কথাই তো বলছি। জামা-জুতো-প্যান্ট পরার পর লোকটি আবদার করল–

' তোমার স্বামী দীর্ঘদিন ব্যবহার করে না এমন আর কী আছে, দাও না!'

পূন : তবে এখানে বলে নেয়া বাঞ্ছনীয় যে স্ত্রীর কাছে ছেড়া জামা-জুতো পরে যে লোকটি এসেছিল সে কিন্তু বলাই বাহুল্য চিরকুমার সভার একজন স্পাই!

পুন ঃ পুনঃ যথারীতি একটা বৌহিক কোটেশন! চির কুমাররা আসলে কেন চিরকুমার থাকে? এর একটা ব্যাখ্যা আছে একটি বিখ্যাত কোটেশনে। কোটেশনটি শোপেন হাওয়ারের–"বিয়ে করার অর্থ অধিকারকে অর্ধেক করা এবং কর্তব্যকে দ্বিগুণ করা" ঐ দুটোর কোনোটাই হয়তো মানতে বা করতে রাজি নয় চিরকুমাররা! কে জানে!

বিউগল বাজিয়ে হাইজ্যাকার

বাসর রাতে স্ত্রী গদ গদ স্বরে সদ্য বিবাহিত স্বামীকে বলল, 'ওগো এমন অদ্ভুত চুমু খেতে শিখলে কোথায় তুমি?'

'এক সময় আমি নিয়মিত পুলিশ বিভাগের ব্যান্ড পার্টিতে বিউগল বাজাতাম যে।'

এটি পুরোনো গল্প। কিন্তু এই পুরোনো গল্পটা যেন আমাদেরকে নতুন করে ভাবনায় ফেলল। সেদিন পেপারে দেখি এক পুলিশ কনস্টেবল যে পুলিশ বিভাগে ব্যান্ড পার্টিতে বিউগল বাজাত প্রতিদিন ভোরে, সে রাতে... না পাঠক যা ভেবেছেন তা নয় শুরুতে গল্পটির সে যা করত তা না সে নিয়মিত রাতে ছিনতাই করত। দিনে ফুলটাইম বিউগল বাদক আর রাতে পার্ট টাইম হাইজ্যাকার। কি অদ্ভুত বৈপরিত্য! যেন 'টু ফেসেস অফ ডঃ জ্যাকেল'!

দেশের হাইজ্যাকারের গল্পতো অনেক শুনেছি আমরা। এবার বিদেশের একটা হাইজ্যাকের গল্প শুনি। ঘটনা স্পেনের। স্পেনে বেড়াতে গেছেন এক বৃদ্ধা মহিলা। হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরছেন এদিক ওদিক...। হঠাৎ এক ছিনতাইকারী তার ব্যাগটা নিয়ে দিল দৌড়! তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিশ বিভাগকে জানালেন। পুলিশ সব লিখে টিখে নিল। পরে খোঁজ নিতে বলল।

চারদিন পর মহিলাকে জানান হল তার ব্যাগটি উদ্ধার করা হয়েছে তবে ব্যাগের ভিতরের কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। বৃদ্ধা মহিলা ভাবলেন মন্দের ভালো ব্যাগটাই সংগ্রহ করি না কেন। তিনি পুলিশের কাছে গিয়ে তার ব্যাগ ফেরত পেলেন। পুলিশকে ধন্যবাদ দিলেন। পুলিশ একটা খাতা এগিয়ে দিল, তিনি যে ব্যাগ ফিরে পেয়েছেন এই মর্মে সই করতে হবে। খাতায় সই করতে গিয়ে বৃদ্ধা টুরিস্ট কলম চাইলেন। পুলিশ অফিসার তার পকেট থেকে কলম এগিয়ে দিলেন। বৃদ্ধা হতভম্ব হয়ে দেখেন কলমটি তারই ছিনতাই হওয়া ব্যাগে ছিল তিনি কিছু বলতে গিয়েও না বলে বিমর্ষ ভঙ্গিতে সই করে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তার মনটা খারাপ। একটা সিগারেট বের করে ধরাতে যাবেন, লাইটার নেই। একজন পুলিশ এগিয়ে এসে তার লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ দিলেন বৃদ্ধা এবং খেয়াল করলেন ঐ লাইটারটিও তার ব্যাগে ছিল!

প্রিয় পাঠক এই গল্প থেকে আমার কি শিক্ষা পেলাম? আমাদের দেশের পুলিশ নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। বিদেশের পুলিশও ডট ডট ডট!!

ধরিব মৎস খাইব সুখে!

আমি যে বাজার থেকে বাজার করি সেখানে অনেক মাছ ওয়ালাই আমাকে চেনে। যাদের কাছ থেকে আমি নিয়মিত পঁচা মাছ কিনে থাকি। মানে তারাই আমাকে পচাঁ মাছ গছিয়ে দেয় আর কি! তো একদিন বাজারে গেলাম, গিয়ে দেখি সব মাছওয়ালাই পারলে বিনা পয়সায় সব মাছ দিয়ে দেয় আমাকে। শুধু আমাকে না যারাই বাজার করতে এসেছে তাদেরকেই। তাদের কথা হচ্ছে মাছ নিয়ে যান, দাম পরে দিয়েন।

কিছুক্ষণ পর রহস্য ভেদ হল। ঐ বাজারের মালিক দুই ভাই। তারা দুই দল করে। একজন আওয়ামী লীগ, একজন বিএনপি। আজ এক দলের মিছিল আছে। মানে এক ভাইয়ের দলের মিছিল আছে সবাইকে ১২টার মধ্যে যেতে হবে! কাজেই ১২টার মধ্যে সব মাছ যেভাবে হোক বেচে শেষ করতে হবে! মন্দের ভালো সেদিন আমি একগাদা তাজা মাছের মিছিল নিয়ে বাসায় ফিরলাম। পয়সা ছাড়াই (অবশ্য পরে পয়সা দিতে হবে)।

তো মৎস বিক্রেতারা মিছিলে যাক। এদিকে আমরা আরেকটা মৎস কাহিনী শুনি–

এক লোক বাজার থেকে আমার মত পঁচা মাছ কেনায় বিশ্বাসী নয়। সে বর্শি নিয়ে গেল এক পুকুরে। সকাল থেকে বর্শি ফেলে বসে থাকে সন্ধ্যে পর্যন্ত, মাছ তো দূরে বর্শির ফাৎনা নড়ল না এক বিন্দু। লোকটি মহা বিরক্ত হয়ে বর্শি গুটিয়ে উঠে পড়ল। যাওয়ার আগে পকেট থকে দুটো পাঁচ টাকার কয়েন বের করে পুকুরে ছুড়ে দিল, তারপর চেঁচিয়ে বলল–

'শালারা আমার টোপ যখন খাবিই না, তাহলে বাজার থেকে কিছু কিনে খাস, না হলে তো না খেয়ে মরবি তোরা!'

এবার লোকটি একটা মাছ বাজারে ঢুকল। অনেক টিপে টুপে একটা মাছ কিনল। দাম দেয়ার পর মাছ বিক্রেতাকে বলল, 'মাছটা তার দিকে ছুড়ে দিতে।'

মাছ বিক্রেতা তাই করল।

লোকটি ক্রিকেট বলের মতো মাছটি ক্যাচ ধরে ব্যাগে ভরে বাড়ি রওনা দিল। বাড়িতে কথা দিয়ে এসেছে পুকুর থেকে মাছ ধরে আনবে। পুকুর থেকে না ধরলেও বাজার থেকে যে 'ধরে' এনেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

রেকলেস ড্রাইভার

বাংলাদেশে বাস দুর্ঘটনা নিত্তনৈমত্তিক ব্যাপার। পাঠকদের মনে আছে নিশ্চয়ই আমেরিকা যখন ইরাক আক্রমণ করে, প্রথম দিনের আক্রমনে একজন ইরাকী মারা না গেলেও বাংলাদেশে ঐ একই দিনে টাঙ্গাইলের এক বাস দুর্ঘটনায় বাইশ জন সাধারণ যাত্রী মারা যান। টিভির খবরে তাদের বিকৃত লাশ আমাদের দেখতে হয়। এ বিষয়টা প্রায়ই হচ্ছে, এখনো হচ্ছে।

বাস দুর্ঘটনা যে শুধু বাংলাদেশেই ঘটে তা নয়, বিদেশেও ঘটে। এমনি একটি ঘটনা নিয়ে একটা গল্প। বিদেশের হাইওয়ে দিয়ে একটা বাস ছুটে চলেছে (কোন দেশ এটা এখানে জরুরী নয়) বাসের ভিতর পঁচিশজনের মতো যাত্রী। যাত্রীরা সবাই কাকতালীয়ভাবে বিকৃত কুৎসিত দর্শন। তো সেই বাসটি হঠাৎ একটা ভায়বহ দুর্ঘটনায় পড়ল। যথারীতি নিয়মানুযায়ী ড্রাইভার দুর্ঘটনার দশ মিনিট আগে বাস থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু বাকি পঁচিশ জন যাত্রী সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। যাকে বলে স্পট বেড!

ততক্ষণাৎ তাদের স্বর্গে হাজির করা হল। ঈশ্বর বললেন, এরা নির্দোষ যাত্রী। এদের স্বর্গে পাঠিয়ে দাও আর স্বর্গের ১০ মিলিয়ন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এদের একটা করে ফ্রি বর দেয়া হবে। ঐ পঁচিশ জন তো মহা খুশি। পঁচিশ জন লাইন ধরে দাঁড়াল। প্রথম জ্ঞান বলল–

'ঈশ্বর আমি সারা জীবন কুৎসিত ছিলাম, আমাকে বদলে দাও সুদর্শন করে দাও।'

'বেশ তাই হবে'। তাই হল।

দ্বিতীয় জনেরও ঐ একই ইচ্ছে। তার বেলায়ও তাই হল। এই করতে করতে চব্বিশজন বদলে গেল। কিন্তু পঁচিশতম জন হো হো করে হেসে উঠল–

' সে কি হাসির কি হল?'

'ঈশ্বর সাধারণত মানুষ দুর্ঘটনায় বিকৃত হয়ে যায় আর আমরা তো আগেই বিকৃত ছিলাম। দুর্ঘটনায় সুদর্শন হয়েছিলাম ওরা বর নিয়ে আবার বিকৃত ও কুৎসিত হল।'

'তাহলে তোমার কোনো বরের প্রয়োজন নেই?'

'আছে।'

'কি?'

'আমি ঐ বদমাশ ড্রাইভারটার সাজা চাই। ও এত রাফ চালায় তার অন্ততঃ সাজা হওয়া দরকার।'

' বেশ তাকে কঠিন সাজা দিলাম।'

'কি সাজা?'

'তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলাম।'

কিন্তু ভাগ্যের কি খেলা! বছর পাঁচেক পর দেখা গেল সেই রেকলেস ড্রাইভারও স্বর্গে। তখন ঐ পঁচিশজন যাত্রী হাউ কাউ লাগিয়ে দিল।

'ঈশ্বর এর মানে কি?'

ইশ্বরকে একটু দ্বিধান্বিত মনে হল! তিনি বললেন–

' দেখ সমস্যা হয়েছে কি ঐ লোকটা বাংলাদেশেও এত রেকলেস গাড়ি চালাত যে বাসের হাজার হাজার যাত্রি ভয়ে বার বার আমার নামই জপ করতে কেবল। আর যে লোকটার কারণে আমার এত 'নাম জপ' তাকে নরকে পাঠাই কি করে!'

ভূতুরে বাড়ি

ধরা যাক এক তরুণ ঢাকায় এসেছে ভাগ্যান্বেষণে। এম. এ. পাস. ননস্টপ বেকার। বাবা-মার বড় সন্তান। এইবেলা মুশকিল হচ্ছে ঢাকা শহরে কোথাও থেকে তো চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করতে হবে নাকি! কিন্তু কম ভাড়ার কোনো বাড়িই পাওয়া যাচ্ছে না। যাও বা পাওয়া যাচ্ছে ব্যাচেলরকে থাকতে দেবে না। এই নিয়ে এক বাড়িওলার সঙ্গে ঝগড়াও হয়ে গেছে–

'ব্যাচেলরকে ভাড়া দেবেন না কেন?'

'দেব না আমার ইচ্ছে, ব্যাস।'

তরুণের মাথায় হিমোগ্লোবিন উঠে গেল। এ সময় তরুণ দেখল বাড়ির ভিতর পিছন দিয়ে এক তরুণী হেঁটে গেল।

'ঐ যে হেঁটে গেলেন উনি নিশ্চয়ই আপনার মেয়ে?'

'এই জন্যই, এই জন্যই আমি কোনো ব্যাচেলরকে বাড়ি ভাড়া দিই না... এর মধ্যে ওদিকে চোখ চলে গেছে!'

'আহ হা বলুন না উনি আপনার মেয়ে কিনা?'

'হ্যাঁ আমার মেয়ে, তাতে কি হয়েছে তোমার?'

'উনি কি অবিবাহিতা?'

'খবরদার আর একটা কথা বললে আমি কিন্তু পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।'

'আহ হা আমি তো আপনার বাড়ি ভাড়া নিতেও যাচ্ছি না। শুধু জানতে চাচ্ছি আপনার মেয়ে অবিবাহিতা কিনা।'

'হ্যাঁ অবিবাহিতা, তাতে তোমার সমস্যাটা কি?'

'আমার কোনো সমস্যা নয়, শুধু একটা অনুরোধ করব আপনাকে।'

'বটে আমার মেয়েকে বিয়ে করে ঘর জামাই হয়ে থাকার অনুরোধ করবি? গেলি হারামজাদা...।' ক্ষিপ্ত বাড়িওয়ালা তখন তুমি থেকে তুইতে নেমে এসেছে।

'ছিঃ ছিঃ গালাগালি করছেন কেন। আমি ভদ্রলোকের সন্তান। আমার অনুরোধ একটাই সেটা হচ্ছে দয়া করে আপনার মেয়েকে কোনো ব্যাচেলারের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না প্লিজ। ব্যাচেলাররা খুব খারাপ!'

বলে তরুণ হাঁটা দিল। নাটক উপন্যাস হলে এ সময় আড়াল থেকে তরুণী বেরিয়ে এসে বলত–

'বাবা উনাকে ফেরাও...আমি উনাকেই বিয়ে করব।'

'তুই কি বলছিস মা?'

হ্যাঁ, তার বুদ্ধিদিপ্ত উত্তর শুনে আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি! যাকে বলে দেখামাত্র প্রেম, শোনা মাত্র প্রেম।'

বাবার একমাত্র আদরের কন্যা। বাধ্য হয়ে ছুটে গিয়ে বাবা তরুণকে বললেন–

'দাঁড়াও।' তরুণ দাঁড়াল।

'আজ থেকে তুমি আমার এখানেই থাকবে। তরুণ হাতের ব্যাগ নামিয়ে রেখে বাবার পায়ে ধরে সালাম করতে যেতেই বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন! দুজনের চোখেই আনন্দাশ্রু!'

কিন্তু যেহেতু এটা গল্প উপন্যাস না সেহেতু বাড়িওয়ালা হাকিয়ে দিল তরুণকে। ঘুরতে ঘুরতে তরুন এক বুড়োর ছাপড়া দোকানে বিষাক্ত ঠাণ্ডা চা খেতে বসল। চা খেতে খেতে চাওয়ালার কাছে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারল এখানে ধারে কাছেই দোতলা বাড়ি আছে। পুরোটাই খালি বাড়ি। কেউ থাকে না। সেই বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই, গ্যাস নেই কিছুই নেই, শুধু একটা জিনিস আছে–

'কি আছে?'

তরুণ ব্যাগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল।

'ভূত আছে।'

'মানে?'

'মানে ওটা একটু ভূতুরে বাড়ি। কয়েকটা ভুত থাকে ওখানে।'

'কুচ পরোয়া নেহি আমি ঐ বাড়িতেই উঠব। দয়া করে আমাকে ঠিকানাটা বলুন।'

চাওয়ালার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে সেই তরুণ চলল সেই ভূতুরে বাড়িতে। একটা মোম কিনে নিতে ভুলল না।

ভূতুড়ে বাড়ির দরজায় নক করতেই, কেউ একজন দরজা খুলল–

'কাকে চান?'

'এটা নাকি ভূতুড়ে বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কে?'

'আমি ভূত।'

'দেখি সরেন আমাকে ঢুকতে দিন। আমি এখানে থাকব কিছু দিন।'

'আমি যে ভূত আপনার বিশ্বাস হল না? আশপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখুন আমি ৫০ বছর আগে মারা গেছি।'

'বিশ্বাস হয়েছে। ভূতুড়ে বাড়ি জেনেই এসেছি।'

'না এখানে থাকা চলবে না।'

ততক্ষণে তরুণ ভূতের শরীর ভেদ করে অন্ধকার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। ভূত দেখল এতো মহা জ্বালা! তখন বাধ্য হয়ে তরুণের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসল। যাকে বলে, ফ্ল্যাগ মিটিং আরকি!

'দেখ তুমি এখান থেকে না গেলে আমি কিন্তু তোমাকে এখন ভয় দেখাতে বাধ্য হব।'

'যতই ভয় দেখাও না লাভ নেই। তিন বছর ধরে বেকার। বাবা-মার বড় সন্তান। সব ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে চলে গেছি। ফলে সে ফস করে মেচ জ্বালিয়ে মোম জ্বালাল। ভূত লাফ দিয়ে তিন ফুটে এক গজ দূরে সরে গেল!'

'দেখ ভাই মানুষ, তোমাকে অনুরোধ করিছ, দয়া করে চলে যাও।'

'কেন আমি এখানে থাকলে তোমার সমস্যা কি? তুমিও থাক আমিও থাকি, মানুষ আর ভূতের সহবস্থান... খারাপ কি?'

'সমস্যা আছে, আমার ছোট একটা বাচ্চা আছে, সে মানুষ ভীষণ ভয় পায়!'

'ও এই কথা, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস আমি ওর ভয় দূর করে দিচ্ছি...চাইল্ড সাইকোলজী আমি ভালো জানি। এম.এস.সি. তে আমার টার্ম পেপারই ছিল চাইল্ড সাইকোলোজির উপর। অবশ্য ঘোস্ট চাইল্ড সাইকোলেজি...'

এই সময় ভূতটা হঠাৎ বাতাসে মিলিয়ে গেল। তরুণ ততক্ষণে বিছানা করে ফেলেছে। শরীরটাও বেশ ক্লান্ত, শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরদিন সকালে তরুণ উঠে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে দেখল। দোতলায় ঘরের এক কোণে তিনটা মার্বেল পড়ে থাকতে দেখল শুধু, দুটো বড়, একটা ছোট! আর কিচ্ছু নেই সব ফাকা!

সে রাতে ভূতের কোনো উপদ্রব হল না। সে রাতে কেন তার পরের রাতেও কোনো উৎপাত নেই। সত্যি কথা বলতে কি আর কোনো ভূতের উপদ্রবই হল না ঐ বাড়িতে। তবে একদিন সেই তরুণ রাতে ঘুমুচেছ হঠাৎ শোনে কয়েকজন মানুষের গলা। ঠিক তার পাশের রুমেই। বিছানা থেকে উঠে উঁকি মেরে দেখে

তিনজন লোক একটা কুপি জ্বালিয়ে এক গাদা টাকা গুনছে! তরুণ ছোট্ট করে একটা কাশি দিল। কাশির শব্দে তিনজন লোকই বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকাল একবার। তারপর তিনজনই 'বাপরে' বলে এক সাথে লাফিয়ে উঠে দরজা ভেঙ্গে হুমমুড় করে ছুটে পালাল। দৌড়াতে দৌড়াতে একজনকে শুধু বলতে শোনা গেল, 'তখনি কইছি এই বাড়িতে ভূত আছে।'

তরুণ ধীরে সুস্থ্যে টাকাগুলো তার নিজের ব্যাগে ভরল। একবার ভাবল গুনে গুনে ঢুকাবে, পরে বাদ দিল, কাল পরশু পেপারে উঠবে নিশ্চয়ই কোনো ব্যাংক থেকে কত টাকা খোয়া গেছে। তখন জেনে নেয়া যাবে।

এই প্রায় গল্পের একটা মরাল আছে সেটা হচ্ছে 'দেয়ার ইজ এ ঘোস্ট স্টোরি (নট ক্রাইম) বিহাইন্ড এভরি সাকসেস।'

পুনঃ একটা তথ্যও দেয়া দরকার সেটা হচ্ছে ভূত প্রথমে মরলে দাড়কাক হয়। আর দাড়কাক মরলে হয় মার্বেল!

হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন

ভ্যালেন্টাইন ডে। ভালোবাসা বাসির দিবস। ভালোবাসা বলতে আগে হৃদয় দেয়া নেয়া বোঝাতো আজকাল মনে হচ্ছে ধরন বদলেছে। মানে হৃদয় দেয়া নেয়া বন্ধ, অন্য কিছু দেয়া নেয়া চলছে! যেমন সেদিন এক খবরে পড়লাম সিঙ্গাপুরের এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে হৃদয় না দিয়ে লিভার দিয়েছে। ব্যাপারটা আরেকটু খোলাসা হওয়া দরকার। সিঙ্গাপুরের প্রেমিকার লিভার নষ্ট হয়ে গেছে, সে জন্য প্রেমিক তার লিভারের কিয়দংশ দান করেছে। ব্যাস এখন প্রেমিকের লিভারের কিয়দংশ নিয়ে প্রেমিকা ক্রমে ক্রমেই বেঁচে উঠছে। তাদের প্রেম, আরো গভীর হয়েছে এবং এই লিভার দান করার কারণে তারা সেখানে এখন সেলিব্রেটি প্রেমিক প্রেমিকা।

আগেই বলেছি ভালোবাসা বাসিতে আজকাল হৃদয় দেয়া নেয়া বন্ধ। তার আরেকটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এটা অবশ্য ভয়ংকর। ঘটনা ভারতের। স্বামীকে ভালোবাসে স্ত্রী। কিন্তু সেই স্বামী নেশাখোর। এখন স্ত্রী বহু চেষ্টা করেও স্বামীকে নেশার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত এক সন্ন্যাসীর সরণাপন্ন হল। সন্ন্যাসী পরামর্শ দিল তাদের একমাত্র শিশু সন্তানকে বলি দিতে হবে। স্বামীর প্রেমে অন্ধ স্ত্রী তাই করল। ভালোবাসার কি ভয়ংকর নমুনা!!

এবার আসা যাক বাংলাদেশে। প্রেম করে বিয়ে করেছে তরুণ-তরুণী। সুখি সংসার। ভালোবাসার কোনো কমতি নেই। একদিন তাদের ঘরে এল নতুন অতিথি। (না শাশুড়ি এসে হাজিল হলেন না) এল নতুন শিশু। ভালোবাসার বন্ধন যেন আরো দৃঢ় হল স্বামী স্ত্রীর। কিন্তু হঠাৎ সমস্যা।

একদিনের ঘটনা। স্বামী অফিসে। স্ত্রী বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। হঠাৎ কাজের বুয়া এসে ঘোষণা দিল–

'খালাম্মা আমারে বিদায় দেন।'

'কেন? কি হল আবার?'

'দেখেন খালাম্মা বাবুর পায়খানা পেশাপ সাফ করি তাতে কোনো সমস্যা নাই। পোলাপান মানুষ কিন্তু সাহেবের...?

স্তম্ভিত স্ত্রী বাচ্চা রেখে উঠে এলেন ব্যাপার বুঝতে। ব্যাপার আসলেই সিরিয়াস। তার স্বীমার (না প্যান্টে নয়) প্রতিটি শার্টের উপর পাখির 'ইয়ে'। আশ্চর্য এর কি ব্যাখ্যা? হতভম্ব স্ত্রী বুয়াকে দু'দিনের ছুটি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে ফোন দিলেন। বান্ধবীকে সব খুলে বলল। সব শুনে চিন্তিত বান্ধবী বলল–

'সব শার্টেই পাখির ইয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো ব্যাপার সিরিয়াস। তুই বুঝতে পারছিস না?'

'না, কি?'

'তোর স্বামী অন্য কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছে।'

'তুই কিভাবে বুঝলি?'

'এতো সোজা। নির্ঘাৎ তোর বর প্রতিদিন পার্কে কোনো গাছের নিচে বসে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে...আর পার্কের গাছের পাখিরা...'

স্ত্রীর কাছে ঘটনা তখন পরিষ্কার হয়ে গেল। যাকে বলে মিনারেল জলবৎ তরলং। ব্যাস সে রাতেই স্ত্রী বাসায় ঢোকা মাত্র চার্জ করে বসল-

'দেখি তোমার শার্টটা।'

স্বামী খুশি মনে শার্ট খুলে দিল। তার মনে আছে ছোটবেলায় বাবা অফিস থেকে এলে মা এগিয়ে এসে বাবার খুলে দেয়া শার্ট আলনায় রেখে লুঙ্গি গামছা এগিয়ে দিতেন। তারপর বাবা গোসল করে এসে দেখতেন চা রেডি। সেই চিরন্তন শ্বাশত ভালোবাসা এতদিন পর পুরানো স্টাইলে ফিরে এসেছে তাহলে। কিন্তু হঠাৎ স্ত্রীর হুঙ্কার।

'এই তো পেয়েছি।'

'কি পেয়েছো?'

স্বামী তো হতভম্ব! স্বামী যতই বোঝানোর চেষ্টা করে সে প্রেম তো দূরে পার্কেই যায় নি গত দু বছরে। পাখি বেছে বেছে তার শার্টে ইয়ে করলে তার কি দোষ, কিন্তু স্ত্রী বুঝলে তো! শেষ পর্যন্ত রফা হল স্ত্রীর ঐ অতি বুদ্ধিমান বান্ধবীকে তার স্বামী যদি বোঝাতে পারে যে আসলেই প্রেম করছে না অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে তাহলে সে ক্ষমা করবে।

তো একদিন সেই স্বামী তার স্ত্রীর বান্ধবীকে নিয়ে সে যে আসলেই প্রেম করছে না বোঝাতে গেল রমনা রেঁস্তোরায়...তারপর রমনা পার্কে... ঘটনাচক্রে দিনটা দিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি (যদিও যখনকার ঘটনা তখনও 'ভ্যালেন্টাইন ডে' ব্যাপারটা বাংলাদেশে শুরু হয়নি)। তারপর আর কি মানুষ খাল কেটে কুমীর আনে। আর আমাদের সন্দেহ প্রবণ স্ত্রী খাল কেটে হাঙ্গর আনল। স্বামী আগে পার্কে যেত না, এখন যায় সঙ্গে থাকে স্ত্রীর সেই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তবে তার গাছতলায় বসে না। রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। বেয়াদপ পাখিদের বিশ্বাস কি!

সূচিত্রা-উত্তম

ভ্যালেন্টাইন ডে, মানে বিশ্ব ভালোবাস দিবসে আসলে ঠিক কি হয়? পুরাতন প্রেম ধুয়ে মুছে যায়? নতুন প্রেম আসে? নাকি ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বোটল? আমি একজনকে চিনি যার কাছে প্রেম ভালোবাসা মানেই সূচিত্রা-উত্তম। তার বুকের গভীরে সূচিত্রা-উত্তম যেন ভালোবাসার 'আইকন' হয়ে আইকা দিয়ে পারমানেন্টলি সাঁটা! তো সেই সূচিত্রা-উত্তম আইকন বন্ধু একদিন আমাকে অনুরোধ করল।

'আচ্ছা তুই আজেবাজে এসব কি লিখস বল তো?'

'আজে বাজে না 'আবজাব'।'

'ঐ হল, যাহা বাহান্না তাহাই তেপান্ন।'

'ওটাও হল না, ওটা হবে যাহা বাহান্না তাহাই চুয়ান্ন নহে।'

'স্টুপিড, আমি তোমার বইয়ের নামে বিজ্ঞাপনে নামি নি, আমি বলতে চাচ্ছি একটা ভালো কিছু লেখ–

'যেমন?'

'ভালোবাসা নিয়ে ভীষণ রোমান্টিক কিছু।'

'তাও আছে ভ্যালেন্টাইন জোকস।'

'আরে ধ্যুৎ, আমি বলছি সূচিত্রা-উত্তমকে নিয়ে নতুন করে কিছু লেখা যায় না? যেমন ধর তারা এই প্রজন্মের তরুণ-তরুণীর কাছে এল...'

তো সেই বন্ধুর আইডিয়াটা নিয়ে এভাবে লিখলে কেমন হয়? যেমন ধরুন...

ঢাকা এয়ারপোর্টে উত্তম-সূচিত্রা নেমে হতাশ হলেন। তাদের রিসিভ করতে কেউ নেই। উল্টো কয়েকটা সিএনজি ড্রাইভার তাদের ব্যাগ ল্যাগেজ নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। উত্তম অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন ওদের। সূচিত্রা বললেন–

'আশ্চর্য তুমি প্রেসকে জানাও নি?'

'জানিয়েছি তো...কিন্তু কেউ তো এল না।'

'তখনি বলেছিলাম, ঢাকায় এসে কাজ নেই। তোমার আমার সেই ক্রেজ এখন আর এখানে নেই...'

'আরে না আছে এখনো অনেক ফটো স্টুডিওতে নাকি তোমার আমার যুগল ছবি ঝুলছে...আমি শুনেছি।'

'আরে রাখ, এখন "টিন এজ প্রেমের" প্যাকেজ নাটক এর যুগ চলছে, তোমার আমার মত বুড়োবুড়ির...'

এ সময় এক তরুণ ছুটে এল। হাতে একটা খাতার মতো কিছু।

'আপনি সুচিত্রা সেন না?'

'হ্যাঁ।'

উত্তম কুমার ফিস ফিস করে বললেন, দেখলে তো ঠিক চিনে ফেলেছে, এখন অটোগ্রাফ দিতে দিতে...। সুচিত্রা সেন বললেন, 'দেখুন আমার কাছে কলম নেই।'

'আরে রাখুন কলম, আপনি আন্ডার অ্যারেস্ট। আপনার ব্যাগে ইন্ডিয়ান শাড়ি পাওয়া গেছে।'

'আমি তো ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ান শাড়িই থাকবে।'

'ও সব বুঝি না...চলুন...'

তো এয়ারপোর্টের ঐ ঝুট ঝামেলা মিটিয়ে উত্তম-সুচিত্রা এসে নামলেন রমনা রেস্তোরাঁয়।

'আমরা কোনো হোটেলে না উঠে রমনা রেস্তরাঁয় কেন?' সুচিত্রা সেন জানতে চাইলেন।

'এখানেই আমি একটা প্রেস করফারেন্স ডেকেছি।'

'প্রেস কনফারেন্স কেন?'

'আরে আমরা দুই বিখ্যাত জুটি ঢাকায় এলাম, আর এমন একটা দিনে এলাম ভ্যালেন্টাইন ডে তে...বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা?'

'আর বোঝাবুঝি, আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না না এয়ারপোর্টে কেউ রিসিভ করল না, উল্টো শাড়ি নিয়ে কত ঝামেলা...এখানেও তো কাউকেই দেখছি না।'

'আসবে আসবে দেখবে পুরো ঢাকা শহরে ভেঙ্গে পড়েছে এখানে। পুলিশ আসবে, বি.ডি. আর আসবে আমাদের প্রোটেক্ট করতে...'

'ঐ যে পুলিশ এসে গেছে।'

বলতে না বলতেই দুজন কনস্টেবল এসে উত্তম-সুচিত্রার পাশে দাঁড়াল।

'আপনাদের থানায় যেতে হবে।'

'কেন?'

'আপনাদের আপত্তিকর ভঙ্গিতে পার্কে বসে থাকতে দেখেছি।'

'কি বলছেন আপনারা? আমরা দু'জন দু'বেঞ্চে বসে আছি...আর তাছাড়া আমরা কে জানেন, আমরা উত্তম-সূচিত্রা...প্রতিটি বাঙ্গালীর হৃদয়ে এখনো ভালোবাসার আইকন হয়ে...'

'কি আইগন বাইগন শুরু করেছেন, জলদি থানায় চলুন। উপর থেকে নির্দেশ আছে...আজ ভ্যালেন্টাইন ডে। পার্ক থেকে কম করে হলেও একশো জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা আপত্তিকর আচরণের অপরাধে লক আপে ঢুকাতে হবে...আপনাদের দিয়েই শুরু করলাম আরকি?'

হাজতের ভিতর সূচিত্রা সেন কাঁদছেন। আর উত্তম কুমার তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়া চেষ্টা করছেন সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য! থানার ওসি হঠাৎ খেয়াল করল 'আরে এরা তো সেই বিখ্যাত উত্তম-সূচিত্রা!' ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে সারা ঢাকা শহরে খবর হয়ে গেলে। দলে দলে ছুটে এল সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, ভক্তকুল, সিনেমার লোকজন। এন টিভি, চ্যানেল আই, এটি এন, সবাই এল, এল না শুধু বিটিভি (তারা তখন এক পাতি বিএনপি নেতার শালার বউভাতের অনুষ্ঠান কাভার করছিল)।

ঝপাঝপ ছবি উঠতে লাগল। পুলিশ বিভাগের লোকজন লজ্জায় গা ঢাকা দিয়েছে। সেই দুই কনস্টেবল সাসপেন্ড। খবর পেয়ে আমার 'উত্তম-সূচিত্র' আইকন বন্ধু' আমাকে ফোন দিল–

'শুনেছিস? উত্তম-সূচিত্রা রমনা থানার হাজতে। লাখ লাখ মানুষ জড় হয়েছে ওখানে...আমিও যাচ্ছি, তুই চলে আয়। আর আরেকটা কথা উত্তম-সূচিত্রা নিয়ে তোকে লিখতে বলেছিলাম, তার দরকার নেই, ওটা আমিই লিখব।'

তারপরের ঘটনা মর্মান্তিক। চর্মচক্ষে উত্তম-সূচিত্রাকে দেখে উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে আমার বন্ধুটির হার্ট এ্যাটাক হল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু! পরদিন প্রথম আলোতে বক্স নিউজ 'হাজতে উত্তম-সূচিত্রাকে এক নজর দেখতে গিয়ে ভীড়ের চাপে পৃষ্ঠ হয়ে একজনের মৃত্যু।'

প্লেনে ফেরার সময় উত্তম-কুমার হাসি মুখে সূচিত্রাকে বললেন–

'দেখলে তো ঢাকার সবাই এখনো কেমন পাগল আমাদের জন্য?'

'হ্যাঁ দেখলাম, ভালোই লাগল এখনো আমরা ওদের কাছে ভালোবাসার আইকন হয়ে আছি।'

'তবে মন খারাপ হচ্ছে ঐ লোকটার জন্য, যে আমাদের দেখতে এসে ভীড়ের চাপে মারা গেল।'

লেখাটা আরেকটু বড় করা যেত, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমাদের লেখা বন্ধ করে যেতে হচ্ছে সেই বন্ধুর কুলখানিতে! খোদা হাফেজ!

ফ্রি টিচার

বছরের শুরুতে ভর্তির সিজন শুরু হয়ে যায়। বাচ্চা নিয়ে গার্জেনদের দৌড়াদৌড়ি, টেনশন সব মিলিয়ে যাকে বলে হচপচ অবস্থা। অবশ্য যাদের বাচ্চা প্লে গ্রুপে কোনো ভর্তি পরীক্ষায় ঝামেলা নেই, শুধু বাচ্চা না কাঁদলেই হল। ওখানে ভর্তি হওয়ার প্রথম এবং একমাত্র শর্ত বাচ্চা মা ছাড়া থাকতে পারে কিনা এবং কাঁদে কিনা।

কিছু কিছু কিন্ডারগার্টেনে অবশ্য শিক্ষকরা আরো ছাড় দেন। প্রথম প্রথম প্লে গ্রুপের মাকেও বাচ্চার সঙ্গে থাকতে দেন। তারপর আস্তে আস্তে বাচ্চা অভ্যস্ত হয়ে গেলে মা সরে পড়েন।

কিন্তু একবার সমস্যা হল, এক মা কিছুতেই তার বাচ্চাকে ক্লাশে রেখে বেরুতে পারেন না। বাচ্চা শক্ত করে মায়ের আঁচল ধরে বসে থাকে। প্রায় ছ'মাস চলে গেল, সব মাই তার বাচ্চাকে ক্লাশে রেখে সরে পড়তেও পারলেও ঐ মা কিছুতেই পারছেন না। স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছুটা বিরক্ত।

শেষ পর্যন্ত ঐ মাকে স্কুলে থেকে একসেট স্কুল ড্রেস দেয়া হল এবং মাকে বলা হল, এখন থেকে তাকেও স্কুল ড্রেস পরে ক্লাশে আসতে হবে এবং ভর্তি ফি দিয়ে রীতিমতো ক্লাশ করতে হবে। নইলে স্কুলের শৃঙ্খলা ব্যহত হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ঐ মা কি করেছিলেন জানি না। তবে আরেক মাকে জানি তারও একই অবস্থা। তবে তিনি স্কুল থেকে স্কুল ড্রেস পাওয়ার আগেই নিজেই প্রস্তাব করেন প্লে গ্রুপের টিচার হওয়ার।

স্কুল কর্তৃপক্ষ সানন্দে রাজি হয়ে গেল। বিনা বেতনে এই বাজারে টিচার পাওয়া তাইবা মন্দ কি!

ফ্রি সার্ভিসিং

ঢাকা শহরে নিয়মিত গাড়ি চালায় এমন একজন আমাকে বলেছিল, 'এই শহরে গাড়ি চাপা দিয়ে মানুষ মেরে ফেললেও সামলানো সম্ভব। কিন্তু অন্যের গাড়িতে ঘঁষা লাগান বা ধাক্কা লাগান মানে আপনার খবর আছে!'

আমরা বরং একটা গল্প শুনি। হঠাৎ বড়লোক হয়েছে এক লোক। ধুপ করে একটা গাড়ি কিনে ফেলল। তাও আবার যে সে গাড়ি নয় মার্সিডিজ বেঞ্জ। তো মার্সিডিজের মালিক গাড়িতে চলে বেরিয়েছে প্রথম দিন।

'আচ্ছা ড্রাইভার, গাড়ির সামনের ঐ গোল ওটা কি?'

মার্সিডিজের সামনে গোল মনোগ্রামটা দেখিয়ে জানতে চাইল নতুন গাড়ির মালিক। ড্রাইভারটা ছিল ধুরন্দর.. সে বলল-

'স্যার বন্দুকের নলের সামনে নিশানা করার জন্য যেমন মাছি থাকে এ গাড়ির মাছি এইটা।'

'তাই নাকি?'

'জ্বী স্যার, যেমন ধরেন আপনে কেউরে চাপা দিবেন ঐটা দিয়ে টার্গেট করে এগুবেন...দাঁড়ান স্যার আপনেরে দেখাই...'

ড্রাইভার রাস্তা পার হচ্ছে এমন একটা লোককে টার্গেট করে এগুতে লাগল। তার প্লান হচ্ছে শেষ মুহূর্তে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যাবে, বোকা মালিকের সঙ্গে একটু মস্করা করা আর কি! তো ড্রাইভার গাড়ির মাছি টার্গেট করে দ্রুত এগুচ্ছে, শেষ মুহূর্তে লোকটাকে বাঁচিয়ে গাড়ি বাঁয়ে কাটিয়ে নিল। কিন্তু কি আশ্চর্য ধাপ করে একটা শব্দ হল আর রাস্তার লোকটা ছিটকে পড়ল ফুটপাথে। ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

'এটা কি হল?' হতভম্ব ড্রাইভার।

'যখন দেখলাম তুমি মিস করলে, সঙ্গে সঙ্গে আমি দরজা খুলে ব্যাটাকে এক বাড়িতে...' নির্বিকার মালিকের উত্তর।

মসজিদের মাইক যেমন খাঁচার ভিতর থাকে সে রকম অনেক গাড়ির ব্যাক মিররও আজকাল চেইন দিয়ে বাধা থাকে। কারণ আর কিছু নয়। গাড়ির পার্টস চুরি যে আজকাল একটা মহান শিল্প হয়ে উঠেছে! এই নিয়ে একটা সত্য ঘটনা...

আমার এক গাড়িওয়ালা বন্ধু নিউ মার্কেটের গেটে গাড়ির পার্ক করে কেনাকাটা করতে গেল ভিতরে। বেশি নয় আধা ঘণ্টা পরে এসে দেখে এক লুঙ্গি পড়া তরুণ তার গাড়ির একটা চাকা প্রায় খুলে ফেলেছে শৈল্পিক দ্রুততায়, মানে শেষ নাটটা সে তখন খুলছে। বন্ধুটি যে পিছে এসে দাঁড়িয়েছে শিল্পী তখনো টের পায়নি। বন্ধুটি আস্তে করে বলল–

'গাড়িটা আমার। যে কটা নাট খুলছিস টাইট করে লাগা, তোকে কিচ্ছু বলব না।'

'জ্বী স্যার।' ঘামতে ঘামতে পুনরায় নাট বল্টু লাগাতে লাগল শিল্পী। পরে বন্ধুটি ঐ চাকাটা তো ঠিকমতো লাগিয়ে নিলই গাড়ির অন্য তিনটি চাকার নাট বল্টুও আচ্ছা মতো সেট করিয়ে নিল, শুধু তাই নয়, গাড়ির খুটি নাটি কিছু সমস্যাও ঠিক ঠাক করে নিল ঐ অটোমোবাইল শিল্পীকে দিয়ে। অবশ্যই ফ্রি সার্ভিস!

এ ঘটনা গাড়িওয়ালা বন্ধু তার আরেক গাড়িওয়ালা বন্ধুকে জানাল যে, সে কি কায়দায় গাড়ি ফ্রি সার্ভিসিং করিয়ে নিয়েছে। শুনে দ্বিতীয় গাড়িওয়ালা একদিন গিয়ে নিউ মার্কেটের সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি পার্ক করল; এবং নিউমার্কেটের ভিতর ঢুকে গেল আধা ঘণ্টার জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় গাড়িওয়ালার ঘড়ি ছিল বিশ মিনিট লেট। সে আধা ঘণ্টা পর এসে দেখে তার গাড়ি জায়গা মতোই আছে তবে চারটি চাকা হাওয়া! পুরো গাড়ি চার চারে ষোলটি থান ইটের উপর দাঁড়িয়ে আছে! (প্রতিটি চাকার নিচে চারটি করে ইট)

কাজেই প্রিয় পাঠক যারা গাড়ি কিনবেন ভাবছেন তাদের জন্য সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, 'গাড়ির স্পেয়ার চাকা একটি নয় চারটি রাখুন।'

ঘোষ খোর

আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর মানুষ আছেন। এক শ্রেণী হচ্ছে এরা ঘুষ খায় এবং কাজ করে দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এরা ঘুষ খায় না এবং কাজও করে না তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে এরা ঘুষও খায় কাজও করে না! এখানে আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন শ্রেণীটি উত্তম। দ্বিতীয় শ্রেণীটি সৎ শ্রেণী, এরা ঘুষ খায় না কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যেহেতু ঘুষ খায় না অতএব কাজও করে না। আবার এই শ্রেণীটি সততার অহঙ্কারে সব সময় নাক উঁচু করে ঘুরে বেড়ায় আর আশে পাশে ঘুষ খোরদের গালিগালাজ করে চব্বিশ ঘণ্টা। এটাই যেন তার কাজ। তৃতীয় শ্রেণীটি সবচেয়ে ওয়ার্স্ট ঘুষ খায় কিন্তু কাজও করে না। দেখা যাচ্ছে আমাদের বর্তমান জীবন যাত্রার উত্তম শ্রেণী হচ্ছে যে ঘুষ খায় এবং কাজও করে।

তার মানে কি দাঁড়াল, 'ঘুষ' ব্যাপারটা এখন আমাদের জীবনে একটা গ্রহণযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে আর কোনো রাখ ঢাক নেই। ঘুষ যে খায় সে তো খায়ই। কিন্তু ঘুষ দেয়াটা একটা বিষয়। ঘুষ দেওয়াটা একটা শিল্পকলা বিশেষ, সবাই পারে না। তো এরকম এক লোক জীবনে কখনো ঘুষ দেয় নি। ঘুষ দেয়ার অভিজ্ঞতাও নেই কিন্তু টেন্ডার দিয়ে বড় কাজ পেয়েছে, এখন ফাইল ছুটাতে গেল একদিন সরকারি অফিসে।

'ভাই সাহেব, আমার ফাইলটা কি এসেছে?'

'আরে ভাই, ফাইল কি আর এমনে আসে চাকা লাগাইতে হয় চাকা লাগানর ব্যবস্থা করে যান।'

লোকটির যেহেতু কখনো ঘুষ দেয়নি কাজেই ঘুষ চাওয়ার ভাষাও বুঝতে পারেনি। ফাইলে চাকা লাগানোর কথা শুনে সে খুশি হয়ে ফেরৎ গেল। খুশি হওয়ার কারণ তার আবার বল-বিয়ারিংয়ের ব্যবসা। সে বল-বিয়ারিং লাগানো চারটা চাকা নিয়ে পরদিন ঐ ঘুষখোরের টেবিলে রাখল।

'এসব কি?'

'ঐ যে কাল ফাইলে চাকা লাগানোর কথা বললেন, চাকা নিয়ে এসেছি!'

এতো গেল বোকা অনভিজ্ঞ ঘুষদাতার গল্প, চালাক ঘুষদাতার গল্পও কম ইন্টারেস্টিং নয়।

যথারীতি চালাক ঘুষদাতা এসেছে ফাইলের খোঁজে। কর্মকর্তা মেঘস্বরে বলল, 'কি ফাইলের ব্যাপারে এসেছেন?'

'না স্যার ছিঃ ছিঃ', জিভে কামড় দিল চালাক ঘুষদাতা। 'একটা দৃশ্য দেখে স্যার মনটা খারাপ হল তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

'কি দৃশ্য?'

'দেখলাম স্যার আপনার মিসেস বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন রিকশা করে...বুকটা, স্যার ভেঙে গেল একটা গাড়ি...'

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কর্মকর্তা। 'আর গাড়ি!'

'কি বলছেন স্যার? আপনার জন্য একটা ইকনোমিক গাড়ি দেখে এসেছি তেল কম খাবে।'

কর্মকর্তা এখন চুপ। চোখ আধাবোজা কল্পনায় গাড়ির পিছনের সীটে বসে গা এলিয়ে দিয়েছেন... একটা হাত কখন যে চলে গেছে ড্রয়ারে...সইয়ের অপেক্ষায় মূল্যবান ফাইলটার দিকে নিজেও জানেন না। ততক্ষণে চালাক ঘুষদাতা উঠে দাঁড়িয়েছে।

'স্যার আজ আসি আগে একটা ভালো ড্রাইভারের খোঁজ করি।'

'বসেন বসেন চা খেয়ে যান। যাওয়ার সময় ফাইলটাও নিয়ে যেয়েন!'

বাস কাহিনী

ঢাকা শহরে প্রায় প্রতিদিনই নানা রকম গবেষণা, রিসার্চ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ে থাকে। তবে যেটা নিয়ে রিসার্চ বা সেমিনার হওয়া উচিত...মানে হাওয়া বিশেষ জরুরি সেটা হচ্ছে না। সেটা কোনটা? সেটা হচ্ছে ঢাকা শহরে কোন বাস কোন দিকে যায়? কেন যায়, আদৌ যায় কিনা, এর ওপর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপক গবেষণা। কেন এই গবেষণা আবশ্যক? আসলে রাস্তায় নামলেই আমার মনে হয় প্রায় প্রতিদিনই নিত্যনতুন বাস সার্ভিস নামছে! কোনটা ইন্টার ডিস্ট্রিক কোনটা বা সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক...মানে সেন্টারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে সব সার্ভিসের সেরা সার্ভিস বোধ হয় এখন পর্যন্ত বিআরটিসির দোতালা ভলভো বাস সার্ভিস। তার আগে বরং ভলভো বাসের একটা গল্প বলে নেই... বেসড অন এ ট্রু স্টোরি...

অফিস টাইমের পর পর ভলভো বাস ছুটছে মিরপুর থেকে মতিঝিলের দিকে। বাস মোটামুটি খালি। নিচতলায় সব ডাবল সিটেই একজন করে বসা। বেশিরভাগ পুরুষ যাত্রী। এর মধ্যে এক মহিলা উঠলেন তার বাচ্চা নিয়ে। এগিয়ে গেলেন একজন স্যুটেড-বুটেড পুরুষ যাত্রীর দিকে।

'আপনি দয়া করে সামনের সিটটায় যাবেন?'

'কেন বলুন তো।' সাদা স্যুটে সুসজ্জিত স্মার্ট পুরুষ যাত্রী জানতে চাইলেন।

'তাহলে আমি আর আমার বাচ্চা পাশাপাশি এক সিটে বসতে পারতাম।'

'আরে আপনার বাচ্চা তো আমার বাচ্চার মতোই... ও তো আমার পাশেই বসতে পারে। সমস্যা কি? আস বাবু... বস আমার পাশে বস।'

সফেদ স্যুটেড-বুটেড পুরুষ যাত্রীর আন্তরিক আহ্বানে বাচ্চাটি বাধ্য হলো তার পাশে বসে আর মহিলা বসলেন ঠিক পিছনের সিটেই আরেকজন পুরুষ যাত্রীর পাশে। বাস চলছে। আচমকা হর হর শব্দ! তাকিয়ে দেখি বাচ্চাটি বমি করে তার পাশের সাদা স্যুট প্যান্ট ভাসিয়ে দিয়েছে। সাদা স্যুট... থুড়ি তখন হলুদ... স্যুটেড-বুটেড লোকটির টিকিট ছিল বোধহয় মতিঝিলের কিন্তু তিনি হুড়মুড় করে নামলেন ফার্মগেটে! বাসে তখন গবেষণা শুরু হয়ে গেছে বমির ঐ হলুদ দাগ সাদা স্যুটের ওপর থেকে উঠবে কি উঠবে না! একদল বলছে উঠবে আরেক দল এর ঘোর বিরোধী... মানে উঠবে না!

একেক বাসে যেন একেক ধরনের গল্প। এটা মেট্রো লিংক বাসের ঘটনা। এটা সম্ভবত মোহাম্মদপুর-মতিঝিলের বাস। তো মেট্রো লিংকের একটা বাস শংকর স্টপেজে থামতেই বেশ একট চেঁচামেচি শুরু হল। কি ব্যাপার? এক লোক মাল নিয়ে উঠবে কিন্তু কন্ডাক্টর উঠতে দেবে না। এক ঢাকাইয়া মুক্কো জোয়ান মালবাহী যাত্রীকে সমর্থন দিল।

'ঐ বেটা মাল লয়া উঠবার পারব না কেলা? দশ কেজি পর্যন্ত মাল উঠবার পারব।' আরো কয়েকজন তাকে সমর্থন দিল সঙ্গে সঙ্গে। পেছন থেকে আরেকজন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। বোঝা গেল তিনিও খাস ঢাকাইয়া (যদ্দুর মনে হলো যে কোনো ন্যায়-অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঢাকাইয়ারাই যেন বেশি সোচ্চার)।

'আবে ঐ... মাল না উঠাইলে গাড়ি রাস্তায় নামাইছস ক্যা? তোর মালিকরে কইস ঘরে মধ্যে বাস চালাইতে?'

এ রকম নানান সব মন্তব্য আসতে লাগল। এর মধ্যে আবার গবেষণা শুরু হয়ে গেল কত কেজি পর্যন্ত মাল বাসে উঠানো যায়। কেউ বলল, বিশ কেজি... কেউ ত্রিশ... কেউ চল্লিশ...এইভাবে বাড়তে বাড়তে দেড় টনে গিয়ে ঠেকল! ততক্ষণে বাস ড্রাইভার ব্রেক করে বাস থামিয়ে ফেলেছে!

'কি হল বাস থামল কেন?'

'এতো ওজন লয়া এই গাড়ি চালব না। গাড়ি ওভারলোড!' বলল বাস ড্রাইভার।

বাস সংক্রান্ত সবচেয়ে উদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল বোধহয় আমার! যে সময় মিরপুর লাইনে এসি বাস চলত। ঝকছকে নতুন বাস। ভাড়া একটু বেশি। যাত্রীরাও সব টিপটপ স্মার্ট। আমিই কেবল আনস্মার্ট যাত্রী।

একদিন তিন কেজি আপেলের একটা পোটলা নিয়ে উঠলাম। একদম শেষ সীটে বসে পোটলাটা রাখলাম পায়ের কাছে। বাস চলছে। হঠাৎ এক সময় তাকিয়ে দেখি আমার আপেলের ঢোঙা শূন্য! গেল কই সব আপেল? এতো দাম দিয়ে কিনলাম। ব্যাপার কি? ব্যাপার আর কিছুই না আপেলের পোটলা মানে ঠোঙা কাত হয়ে সব আপেল এসি বাসের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে বাস যখন ছুটছে তখন আপেলগুলো সব এক সঙ্গে আমার দিকে তীর বেগে ছুটে আসছে! আবার বস যখন স্পিড কমায় বা ব্রেক কষে সব আপেল এক সঙ্গে তীর বেগে ছুটে যায় সামনের দিকে। নিউটনের স্থিতি জড়তার প্রাকটিক্যাল ক্লাস শুরু হয়েছে যেন। বাসের যাত্রীদের দৃষ্টি সব জানালা দিয়ে বাইরে ফলে কেউ বাসের মেঝেতে আপেলগুলোর এই রিলে রেস খেয়াল করছে না। আমি করলাম কি বাসের স্পিড বাড়তেই তীর বেড়ে ছুটে আসা আপেল একটা দুটো করে ঠাঙায় ভরতে লাগলাম। অনেকটা টেস্ট ম্যাচের উইকেট কিপারের মতোই যেন। আবার বাস ব্রেক করা মাত্র সব আপেল ছুটে যাচ্ছিল সামনের দিকে...আবার স্পিড... আবার আমার কাছে...এইভাবে করতে করতে যখন শেষ স্টপেজে এলাম (সেখানেই আমার বাসা) তখন আমার আপেল সংগ্রহ

অভিযান মোটামুটি সমাপ্ত। আমি হৃষ্টচিত্তে নেমে যাচ্ছি...যাক সব কটা আপেল যাত্রীদের অলক্ষে উদ্ধার করা গেছে। হঠাৎ শুনি বাসের গেট দিয়ে নামতে নামতে এক বাচ্চা তার বাবাকে বলছে–

'বাবা আপেল দুটো যে পেলাম কি করব?' বাবা ফিস ফিস করলেন, 'গাধা পকেটে ঢোকা।'

বুঝলম দুটো আপেল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বাস থেকে নেমে রিকশা নিলাম। হেঁটেই যাওয়া যায়, হাতে পোটলা দেখে রিকশায় উঠলাম। রিকশাওয়ালা তখন ঐ থেমে থাকা এসি বাসের সামনে দিয়ে রিকশা ঘুরিয়ে বাসার দিকে এগুচ্ছে। দেখি বাসের ড্রাইভার আর কন্ডাক্টর দুজনের হাতে আরো দুটো আপেল। কন্ডাক্টর মোটামুটি কামড় বসিয়ে দিয়েছে। বুঝলাম আরো দুটো আপেল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি! একুনে চারটা মিসিং!

এবার সাধারণ মিনিবাসের গল্পে আসি। এই বাসের সবচেয়ে কমন গল্প হচ্ছে সেই যে এক যাত্রী মাথা সোজা করে বাসের ভিতর দাঁড়াতে পারছে না বাধ্য হয়ে বলে উঠলেন, 'বাঙালি জাতিকে এরা আর কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেবে না।'

মিনিবাসের একটা বড় মুশকিল হচ্ছে সব যাত্রীরা স্টপেজ ছাড়া যেখানে সেখানে থামিয়ে নেমে পড়ে। তো একবার এক যাত্রী সম্ভবত তার বাসার গলির মুখে বাস থামাতে বলল, ড্রাইভারও থামাল। লোকটা নামতে নামতে বিরক্তি প্রকাশ করল–

'এই কই রাখলা গলিডার মাঝখানে রাখলে না সুবিধা হইতো।' ড্রাইভার মধুর হাস্যে বলল, 'তাইলে, আবার উইঠা বসেন, আপনেরে বাসায় নামাইয়া দিয়া আসি ঐটাইতো বাকি আছে!'

দেশী বাস থাক। বিদেশী বাসের গল্প দিয়ে শেষ করি। এটাও বেসড অন এ ট্রু স্টোরি! পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ করি সবচাইতে বিতর্কিত বাস সার্ভিস হচ্ছে ইংল্যান্ডের স্ট্যাফোর্ডশয়ারের 'টাইম সার্ভিস' বাস। তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সময়ের ব্যাপারে তারা খুবই সিরিয়াস। টাইম ধরে বাস ছাড়ে এবং টাইম ধরে বাস গন্তব্যে পৌঁছে। এই সার্ভিসের কারণে তারা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অচিরেই দেখা যায় টাইম টেবল রক্ষা করার জন্য তারা আর যাত্রী উঠাতে পারছে না। যাত্রী উঠাতে তাদের যে সময় ব্যয় হয় তাতে করে তাদের টাইম টেবল রক্ষা করা সম্ভব নয়। ফলে খুব শিগগির দেখা গেল 'টাইম সার্ভিস' বাসস্টপে সারিবদ্ধ হয়ে যাত্রীরা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আর তাদের চোখের সামনে দিয়ে হুশহাশ করে যাত্রীহীন খালি বাস চলে যাচ্ছে আর আসছে! আসছে আর যাচ্ছে!

ওম সার্ভিস

কদিন আগে সারা দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল লাগাতার শৈত্য প্রবাহ। সেই সময় একটা মজার খবর পড়লাম। 'সাপ্তাহিক যায় যায় দিন'-এ। নারায়ণগঞ্জের কয়েকজন তরুণ মিলে 'ওম বিক্রয় কেন্দ্র' খুলেছে! প্রতি মিনিট দুই টাকা। তারা কিছু লাকড়ি জোগাড় করে সব সময় আগুন জ্বেলে রাখে। দুই টাকা দিলে আপনি এক মিনিট 'ওম' কিনতে পরেন মানে শরীর গরম করতে পারেন এ আগুনের পাশে বসে! তো তাদের ব্যবসা নাকি রমরমা। পথচারীরা বেশ সাড়া দিয়েছে তাদের এই ব্যবসায়। লাকড়ি কিনতে কিনতে নাকি তাদের নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা। প্রতি মিনিট দু' টাকার জায়গায় তারা তিন টাকা করবে কিনা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে!

এই খবর পড়ে আরেক বেকার ছেলে কম্বল নিয়ে ওম বিক্রির চিন্তা-ভাবনা করছে। তার কাছে নাকি এমন এক বিদেশী কম্বল আছে গায়ে দিয়ে গরমের চোটে ঘাম ছুটে যায়! সে ভাবছে ফুটপাতে ঐ কম্বল নিয়ে বসে যাবে। এক সঙ্গে চারজন ঐ কম্বলের নিচে ওম সংগ্রহ করতে পারবে। তো শৈত্য প্রবাহ চলে যাবার কিছুদিন পর সেই কম্বলের মালিকের সঙ্গে দেখা।

'কি তোমার কম্বলের ওম ব্যবসার খবর কি?'

'খবর খারাপ।'

'কি রকম?'

'কম্বল নেই।' বিষণ্ন মুখে সে জানায়।

'কেন কম্বল হাইজ্যাক হয়ে গেছে?'

'না হাইজ্যাক হয়নি।'

'তাহলে?'

'আসলে কম্বলের ব্যবসা প্রথম দিকে ভালোই হচ্ছিল পরে দেখি সবাই বসে বসে কম্বল থেকে লোম বাছে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি লোম বাছতে বাছতে আমার কম্বল উজাড়! মানে কম্বল নাই!'

ঐ প্রবল শৈত্য প্রবাহের সময় এক তরুণকে পেয়েছিলাম সে ফিনফিনে এক শার্ট পরে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই আশ্চর্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার তোমার ঠাণ্ডার লাগে না?'

'নাহ।'

'কেন?'

'আমার কাছে একটা বিদেশী বই আছে...'

'বই দিয়ে শীত নিবারণ?'

'অনেকটা ঐরকমই...বইটার নাম "সুপার ডুপার এডাল্ট জোকস" ওটার দু'একটা জোকস পড়লেই শরীর বেশ গরম থাকে।'

শীত নিয়ে প্রতিযোগিতা হচ্ছে দুজনের মধ্যে। কার এলাকায় কত শীত! একজন বলছে–

'আমার এলাকায় এত শীত যে সামান্য একটু ওমের আশায় শেষ পর্যন্ত ডিপ ফ্রিজে ঢুকতে হয়।'

'আর আমাদের তো আরো খারাপ অবস্থা।'

'কি রকম?'

'দু' কানে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয় সব সময়।'

'কেন কানে আগুন কেন?'

'আমরা যখন কথা বলি কথাগুলো পর্যন্ত ঠাণ্ডায় জমে যায় তখন কথা বুঝতে কানের কাছে জ্বলা আগুনে কথাগুলো গলে ঢুকে তখন আমরা বুঝতে পারি!'

বন্ধুর মত পাশে আসুন

"দয়া করে আপনি আমার পিছে পিছে হেঁটে আসবেন না, কারণ আমি আপনাকে পথ দেখাতে পারব না। আমার সামনে দিয়েও হাঁটবেন না, কারণ আমি নেতা হিসেবেও আপনাকে মেনে নিতে পারব না।...বরং আমার পাশাপাশি হাঁটুন, আমি আপনাকে বন্ধুর মতো গ্রহণ করব" বাক্যটি একটি বিখ্যাত 'কোটেশন'। তো এক তরুণের কোটেশনটি ভীষণ পছন্দ হল। প্রায়ই বিভিন্নজনকে সে কোটেশনটি বলে। তো একদিন সে রাস্তা দিয়ে চলেছে তখন সন্ধ্যা। সে খেয়াল করল তার সামনে দিয়ে এক লোক হেঁটে চলেছে। সে বলে উঠল, 'ভাই আমার সামনে নিয়ে হাঁটবেন না, কারণ আমি নিশ্চিত আপনাকে আমি নেতা হিসেবে মেনে নিতে পারব না।'

সামনের লোকটি কি বুঝল সে একটু থেমে তার পিছে চলে এল। এবং পিছে পিছে হেঁটে আসতে লাগল। এবার তরুণ বলে উঠল, 'ভাই আমার পিছনে পিছনে হেঁটে আসবেন না দয়া করে, কারণ আমি আপনাকে সঠিক পথও দেখাতে পারব না!'

পিছনের লোকটি কি বুঝল সে এগিয়ে এসে তার পাশে প্রায় গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগল। তখন তরুণ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আপনি আমার পাশে পাশে হাঁটুন আমি আপনাকে বন্ধুর মত গ্রহণ করব...'

শেষ বাক্যটি বলে কোটেশন প্রেমিক যথেষ্ট পুলকিত বোধ করল। পৃথিবীতে বোধ করি এই প্রথম কেউ একটি বিখ্যাত কোটেশনের ফিল্ডওয়ার্ক করল মানে প্রাকটিক্যালি প্রয়োগ করল। কিছুক্ষণ পর তরুণটি আবিষ্কার করল তার পাশে পাশে হাঁটা লোকটি আর নেই। হয়তো অন্য কোনো গলি দিয়ে চলে গেছে। আর তখনি সে পকেটে হাত দিয়ে দেখে তার মানি ব্যাগটাও নাই!

সাংসদ সমাচার

তিনশো সাংসদের জায়গায় এখন নাকি চারশো পঞ্চাশজন সাংসদ হবে। তা হোক, আমি ব্যক্তিগতভাবে এর পক্ষে। দেশে জনসংখ্যা হুহু করে বাড়ছে, ছিনতাই বাড়ছে, খুন, রাহাজানি বাড়ছে, ধর্ষণ বাড়ছে, এসিড মারা বাড়ছে, কিপন্যাপিং বাড়ছে... নেশাখোর বাড়ছে, অফিস-আদালতে ঘুষ দেয়া-নেয়া বাড়ছে...মোট কতা সবই এখন বাড়তির দিকে...তো সাংসদ বাড়বে না? সাংসদ বাড়লে জনগণের কী লাভ হবে সে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই, তবে টিভির প্রাইভেট চ্যানেলগুলোর যে লাভ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা এই চ্যানেলগুলো প্রায় প্রত্যেকেই তৃতীয় মাত্রা টাইপের অনুষ্ঠান করে থাকে যেখানে দু'দলের দু'জন সাংসদ ডেকে এনে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। সেই ঝগড়া দর্শক খুব আগ্রহ নিয়ে দেখে। যদ্দুর জানি এই ধরনের ককফাইট টাইপ অনুষ্ঠানগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়। বিদেশী চ্যানেলে 'ডব্লু ডব্লু এফ' মানে রেসলিং অনুষ্ঠান যেমন জনপ্রিয়, দেশের প্রাইভেট চ্যানেলে এই সাংসদদের ঝগড়া অনুষ্ঠানটিও জনপ্রিয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রেসলিং অনুষ্ঠানটা কিন্তু পাতানো অনুষ্ঠান। মানে সাজান অনুষ্ঠান। এই রেসলিং খেলায় যে হারে সে নাকি বেশি টাকা পায়। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় যে, এই পুরো অনুষ্ঠানটা সাজান। তাহলে সাংসদদের অনুষ্ঠানটিও কি সাজানো? না মোটেই না। কিন্তু ক'দিন আগে 'প্রথম আলো'-তে দেখলাম দুই প্রধান দল বাইরে বাইরে ফাটাফাটি সম্পর্ক থাকলেও ভিতরে ভিতরে তাদের বেয়াই রাজনীতি নাকি খুবই মধুর! মানে ভিতরে ভিতরে তারা একজন আরেকজনের বেয়াই...ব্যবসা-বাণিজ্যও ভাগাভাগি করে নিচ্ছে দিব্যি...শুধু চ্যানেলে মুখোমুখি হলেই ধুন্ধুমার লেগে যাচ্ছে...

যথারীতি এবার একটা গল্প। দুই সাংসদ (কোন দেশের কে জানে!)

'ওহে তোমার এলাকায় তুমি যাও-টাও না?'

'যাব না কেন অবশ্যই যাই।'

'শেষ কবে গিয়েছিলে?'

'সেটা বলতে পারব না...তবে পাঁচ বছর অন্তর একবার যাই।'

'ও বুঝেছি...নির্বাচনের আগে আগে...ক্যাম্পেইন করতে...'

'আরে না সে জন্যে নয়।'

'তাহলে?'

'আমি যে ওই এলাকার লোক তার একটা ছাড়পত্র বের করতে যাই...'

তো ওই দু'জন সাংসদের একজনের মৃত্যু হলো। সোজা চলে গেল স্বর্গে। স্বর্গে গিয়ে সাংসদ ভদ্রলোক স্বর্গের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করলেন, 'আমি ইহজগতে তো এলাকার লোকজনদের জন্য কিছুই করিনি। দয়া করে পরকালে মানে স্বর্গে আমাকে একটা সুযোগ দেয়া হোক। আমি তাদের জন্য কিছু করতে চাই।'

'সেটা সম্ভব না।'

'কেন?'

'কারণ আপনার এলাকার লোক সব নরকে।'

'সে কি নরকে তো থাকার কথা আমার। তারা কেন?'

'তারা কোনো ঝুঁকি নেয়নি...পরকালে অন্তত আপনার থেকে দূরে থাকতে চায়।'

তিনশো সাংসদকে বাড়িয়ে চারশো পঞ্চাশ সাংসদ করা হয়েছে শুনে সুশীল সমাজের একজন (!) মন্তব্য করল–

'চারশো পঞ্চাশজন বেশি। কিছু কমানো উচিৎ।'

'কতজন কমানো উচিৎ?'

'এই ধরেন অন্তত ত্রিশজন!'

সমস্যা সবুর

অনেক দিন আগের কথা।

কোরবাণীর গরু ছাগলের হাটে এক লোক গরু কিনতে গেল। দর দাম করে গরু কিনল। কোনো সমস্যা হল না। ছাগল কিনতে গিয়েই সমস্যা শুরু হল। এক লোক ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'ছাগলের সাইজ এত ছোট কেন?'

'কি কন স্যার ছাগলতো ছাগলের সাইজেই হইব।'

'কিন্তু তোমরা যে সারা শহরে পোস্টারে ছবি ছেপেছ গরু-ছাগলের সাইজ এক রকম?'

লোকটাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল। একজন আবার সাইড থেকে বলে বসল, ছার এই ছাগলটা একটা লয়া যান ফটোস্ট্যাট কইরা বড় কইরা লয়েন। ব্যাস ঘৃতে যেন প্রথমে পেট্রল পড়ল তারপর অগ্নিসংযোগ হল। লোকটি এবার ষাঁড়ের মতো না চেঁচিয়ে সিংহের মতো গর্জন করে উঠল, 'কোন শালা এই কথা বলল?'

'দুলাভাই আমি কইছি।'

এবার ভীড়ের মধ্যে আরেকজন আওয়াজ দিল। লেগে গেল বিরাট হাউ কাউ!

উপরের এই ঘটনা শুনে মনে হতে পারে এটা বোধ হয় বানোয়াট গপ্পো। না, বানোয়াট নয়। ৮৫% সত্যি!

আমাদের এক বন্ধু আছে আমরা তাকে আড়ালে ডাকি 'সমস্যা সবুর' কারণ তার হবি হচ্ছে খামোকা খামোকা সমস্যা সৃষ্টি করা। বহু আগে ঢাকা কলেজের সামনে যখন চিটাগাং রেস্টুরেন্ট ছিল তখন সেখানে একটা বিশাল সাইনবোর্ড ঝুলত। যার একদিকে ছাগলের ছবি আরেক দিকে ছাগলের সমান মুরগির ছবি। তো আমাদের 'সমস্যা সবুর' মানে সবুর হোসেন একদিন এ রেস্টুরেন্টে মুরগির রোস্টের অর্ডার দিয়ে মুরগির সাইজ দেখে গরুর হাটের মতো হাউ কাউ লাগিয়ে দিয়েছিল।

'মুরগির সাইজ এত ছোট কেন?'

'মুরগি তো মুরগির সাইজেই হইব।'

'তাইলে বাইরে এত বড় ছবি আঁকছ ক্যান?'

তবে সেবার চিটাগাং রেস্টুরেন্টে সমস্যা খুব বেশিদূর গড়ায় নি। ঢাকা কলেজের কয়েকজন বিচক্ষণ ছাত্র পাশের টেবিলেই চা খাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল বেশ স্বাস্থ্যবান ও তরুণ সে উঠে এসে সবুর হোসেনকে ঘাড় ধরে রেস্টুরেন্টের বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

'সবুরে মেওয়া ফলে' এই বিখ্যাত বাংলা প্রবাদটি আমাদের সবুর হোসেনের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। সে মোটেই সবুর করতে না...নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করত। এবং আমাদের ঝামেলায় ফেলত। শেষ শেষ আমরা বন্ধুরা পরামর্শ করে ঠিক করি এই 'প্রতিভা' দেশে থাকলেই বিপদ। তাকে আমরা নানাভাবে উৎসাহিত করে বিদেশে পাঠিয়ে দেই। সে এখন সুদূর সাইপ্রাসে বসে নির্ঘাৎ নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে মাঝে মাঝে আমাদের বেয়ারিং চিঠি পাঠায়! যদিও বিদেশ থেকে বেয়ারিং চিটি আসার কথা না কিন্তু সে এমন এক কায়দায় চিঠি লিখে যে আমাদের 'সমস্যা সবুর মেইল ট্যাক্স' দিয়ে চিঠি ছাড়াতে হয়!

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে সে এক বিদেশীনীকে বিয়ে করে সমস্যায় ফেলেছে। এবং গফুর হোসেন নামে এক নতুন ক্ষুদে সমস্যাকে পৃথিবীতে ছাড়পত্র দিয়েছে। তবে তারা এখন পর্যন্ত ভালোই আছে!

জোকস লেখক

যারা লেখালেখি করেন (দলিল লেখক ছাড়া) তাদের ঈদ এলেই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, সেটা হচ্ছে,

'কোথায় কোথায় লিখছেন?'

একই প্রশ্ন বদলে যায়, যখন বই মেলা এসে পড়ে 'ক'টা বই বেরুচ্ছে আপনার?' তবে ইদানিং নতুন উপসর্গ জুটেছে ঈদের আগে আগে নতুন আরেকটা প্রশ্ন করা হয় সেটা হচ্ছে, 'নাটক কটা যাচ্ছে?'

আমাদের সেদিন একজন এই প্রশ্ন করে বসল, 'এবার ঈদে কোনো নাটক যাচ্ছে?'

'কেন যাবে না? গত রোজার ঈদে তো শুনেছি তিন চ্যানেলে তিন ত্রিশে নব্বইটা নাটক গেছে।'

'না না আমি বলছি আপনার লেখা কোন নাটক...'

'আমি? আমি কেন?'

'না মানে লেখালেখি করেন তো ভাবলাম...'

আমি তখন তাকে বোঝালাম আমি আসলে কার্টুনিস্ট। কার্টুন আঁকাই আমার কাজ। আমি রম্য লেখার চেষ্টা করছি এটাই ক্রাইম করছি...এখন আবার নাটক লিখতে বসলে সেটা হবে সুপার ডুপার ক্রাইম।

তো আমি যেটা বুঝলাম বুদ্ধিজীবি হতে হলে বেশ কয়েকটা পর্যায় আছে। প্রথমতঃ লেখালেখি করতে হবে। ঈদ এলে ঈদ সংখ্যায় লিখতে হবে এবং একটা দুটো নাটকও বিভিন্ন চ্যানেলে যেতে হবে (ঈদের অষ্টম দিনে হলেও ক্ষতি নেই। নাটক যাওয়া দিয়ে কথা)। বই মেলা এলে বইতো বেরুতেই হবে। আরেকটা ব্যাপার জরুরি, দৈনিক পত্রিকায় ডেঙ্গু মশা, বুড়িগঙ্গা নদী দখল, মাদককে না বলুন এ ধরনের বিষয়ের উপর গুরুগম্ভীর বক্তব্য রাখতে হবে। আরো ভালো হয় সপ্তাহে অন্তত কোনো একটা আলোচনা অনুষ্ঠানে (হোক না সেটা আলু পটলের মূল্য বৃদ্ধির আলোকে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয় টাইপ) কোনো বাংলা চ্যানেলে নিয়মিত উপস্থিত হওয়া! তাহলেই আপনি একজন পরিপূর্ণ বুদ্ধিজীবি!

আপনারা ভাববেন না আবার যে আমি বুদ্ধিজীবি হওয়ার চেষ্টা করছি। আসলে জোকস লিখে বুদ্ধিজীবি হওয়া যায় না। বড়জোর পরজীবি বুদ্ধিজীবি হওয়া যেতে পারে মানে পরের ধন আত্মসাৎ করে বুদ্ধিজীবি হওয়া আরকি। বরং একটা ঘটনা বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

প্রতীক প্রকাশনা থেকে যথারীতি আমার নতুন একটা জোকসের বই বেরিয়েছে। বইটা মার্কেটেও এসেছে শুনে আমি নিউমার্কেট গেলাম। বইটা কিনে দেখি কেমন হল। এক দোকালে ঢুকলাম।

'জোকসের বই আছে?'

'আছে', দোকানী সাগ্রহে দু'তিনটা ইন্ডিয়ান জোকসের বই বের করল।

আমি বললাম, 'না, না দেশী জোকসের বই বের করুন। দোকানী মনে হল একটু হতাশ হল। বিরস মুখে আমার নতুন বইটি বের করে দিল 'ফোর টুয়েন্টি ফোর আওয়ার জোকস' আমি দুটো কিনলাম একটা নিজের জন্য আরেকটা একজনকে গিফট করব। দুটো কেনায় লোক মনে হল খুশি হল, বলল, 'আপনি খুব জোকস পড়েন?'

'পড়ি।'

'অন্য লেখকের বইও আছে দেখবেন?'

'নাহ আমি আবার এই লেখক ছাড়া জোকস পড়ি না। এই লেখকের জোকসগুলি ভালোই হয় কি বলেন?' আমি নিজেই নিজেকে ব্যাক দেয়ার চেষ্টা করি।

'আছে আর কি... সবই মারা জোকস, এইহানতে ঐহানতে মাইরা বই বানায়... এই রকম আপনেও বানাইতে পারেন...'

আমি তখন চোখে মুখে আগ্রহ ফুটিয়ে বলি, 'ভাই তাহলে আপনাকে একটা সত্যি কথা বলি, আমার কাছে ভালো ভালো ১০০০টা নতুন জোকস আছে, ওইখানেতে এইখানেতে মেরে সংগ্রহ করেছি। একজন প্রকাশক জোগাড় করে দিতে পারেন?'

লোকটি বিরস কণ্ঠে বলল, 'আমরা ভাই বই বেচি। বাংলাবাজার যান ঐখানে প্রকাশক পাইবেন তারা যদি করে। এক কাজ করেন আপনার নাম ঠিকানা দিয়া যান। আমার এখানেও অনেক প্রকাশক আছে তাদের কয়া দেখতে পারি।'

আমি অতি উৎসাহী হয়ে আমার নাম ঠিকানা লিখে দিলাম। লোকটি নামটা পড়ে হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি তখন দোকানের বাইরে!

চা চ্যালেঞ্জার

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসছিলাম উন্মাদের দলবল নিয়ে। খুব সম্ভব চট্টগ্রামের শিল্পকলা একাডেমিতে তিন দিনের এক কার্টুন প্রদর্শনী করে। তো আমরা যে বগিতে উঠেছিলাম সেটাও ছিল বিচ্ছিন্ন একটা বগি। সমস্ত ট্রেনের ভেতর দিয়ে এক বগি থেকে আরেক বগিতে হাঁটাহাঁটি করা গেলেও আমাদের বগিতে আমরা ছিলাম গৃহবন্দি মানে বগিবন্দি। তো এর মধ্যে দু একজনের চায়ের নেশা চাগিয়ে উঠল।

'আহসান ভাই চা খাওয়া দরকার।'

'খাও সমস্যা কী?'

'কিন্তু আমরা তো আছি বিচ্ছিন্ন বগিতে। বুফে কারে যাওয়ার কোন উপায় নেই। এখন কী করা যায়?'

'সেক্ষেত্রেও চা খাওয়া সম্ভব তবে প্রতি কাপ চায়ের দাম পড়বে দুশো দু টাকা খাবে?'

'মানে?'

'বুঝলে না? আমাদের বগি থেকে চা খেতে হলে চেন টেনে ট্রেন থামাতে হবে। চেন টানার ফাইন দুশো টাকা আর চা তো প্রতি কাপ দু'টাকা! একুলে কত হল?'

আমার বুদ্ধি শুনে সবাই ঝিমিয়ে পড়ল। তবে একজন সে নাছোড়বান্দা। সে বাই হুক আর ক্যাপ্টেন জেমস কুক চা খাবেই।

'তাহলে আর কী জেমস কুকের খুড়ি বন্ডের মতো ছাদে উঠে যাও ক্রলিং করে গিয়ে পাশের বাগিতে লাফিয়ে পড়। সেখান থেকে বুফে কারে...

সে যখন মোটামুখি চায়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে ছাদে উঠার পরিকল্পনা করছে তখন বোধ হয় ঈশ্বর মুচকি হেসে ভাবলেন, 'দাঁড়াও তোমাকে চা খাওয়াচ্ছি।'

হ্যাঁ সে ট্রেনের দরজাটা সবে মাত্র খুলেছে কোত্থেকে একটা ঢিল এসে সরাসরি লাগল চোখে 'মাগো বাবা গো' বলে ট্রেনের বাইরে লাফিয়ে পড়লেই

ভালো করত, না সে জাতে মাতাল তালে ঠিক, লাফিয়ে ট্রেনের ভিতরেই এসে পড়ল সশব্দে। আমাদের চা খাওয়া মাথায় উঠল। চা ফেলে আমরা সবাই চোখ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

আক্রান্ত চা চ্যালেঞ্জার তখন চোখে রুমাল চেপে কোঁ কোঁ করছে আর অন্য সবাই এক চোখেই যে কত সুবিধা তা নিয়ে গবেষণায় নেমে পড়ল। এবং এই পৃথিবীতে কত বিখ্যাত লোকের যে এক চোখ ছিল এবং তারা যে কত আরামে ছিল সেটা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

যা হোক সে যাত্রা ঢাকা এসে চা চ্যালেঞ্জারের চোখ বাঁচন সম্ভব হয়ে ছিল কোনো রকমে। তবে যে পরিমাণ খরচ গিয়েছিল তার থেকে চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে চা খাওয়াই বোধ হয় ভালো ছিল।

আরেকটা ঘটনা, অনেকটা এ রকমই। ছেলে এসে বাবাকে ধরে বসল।

'বাবা, হলে যেয়ে সিনেমা দেখব।'

'দেখ।'

'টিকেটের টাকা দাও।'

'কত?'

'তিন লাখ পঁচিশ টাকা।

'মানে?' বাবার প্রায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ার অবস্থা!

ছেলে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কী করব সিনেমার হলটা যে দশ মাইল দূরে। আমার বন্ধুরা সব নিজের নিজের গাড়িতে করে যায়। রিকণ্ডিশন একটা গাড়ি তিন লাখে হয়ে যাবে আর সিনেমার টিকেট পঁচিশ টাকা।'

বাবা ছেলের আবদার শেষ পর্যন্ত রেখেছিলেন কিনা তা অবশ্য আর জানা সম্ভব হয়নি!

নরকে লোকাল কল!

বহুদিন আগের ঘটনা। আমার এক প্রকৃত বন্ধু। প্রকৃত বন্ধু বললাম এ কারণে যে, সে প্রকৃতই আমার ভালো চায়। তো সেই প্রকৃত বন্ধু একদিন ফোন করল–

'আহসান?'

'হ্যাঁ, কি খবর?'

'খবর ভালো, শোনো খুব শিগ্রী টিএন্ডটি মোবাইল ফোন ছাড়ছে। আমার এক আত্মীয় এজেন্সিও নিয়েছে। এখন তুই যত জলদি পারিস তোর গ্রামীণ ফোনটা বিক্রি করে দে... কারণ টিএন্ডটির মোবাইলে যে সুবিধা পারি...'

আমি অবশ্য প্রকৃত বন্ধুর কথায় গুরুত্ব দিলাম না। ফোন বিক্রি করলাম না। এই ঘটনার পর শুধু বুড়িগঙ্গ কেন বাংলাদেশের সব নদী দিয়েই টনটন পানি পাস হয়ে গেছে শুধু মর্তে পানি কেন আকাশেও টন টন মেঘ জমেছে এবং পরিষ্কার হয়ে গেছে কিন্তু টিএনটি'র মোবাইল ফোন বাজারে দেখা যায়নি।

প্রায় প্রায়ই দৈনিক পত্রিকায় বক্স নিউজ আসে "অচিরেই বাজারে টিএন্ডটি'র মোবাইল আসছে," তারপর আবার চুপ। কোনো ফলোআপ নেই। তো বাজারে গুজব আছে যখনই উচ্চ মহলে 'ট' বিষয়ক ক্রাইসিস দেখা দেখ তখনই নাকি ঐ বক্স নিউজ ছাপা হয়। '...অচিরেই আসছে...' আর তখনই তড়িঘড়ি করে অনান্য ফোন কোম্পানিগুলো এক সঙ্গে নগদ কিছু 'ট' ধরিয়ে দেয়... তারপর আবার চুপ!'

অনেকটা ঐ 'রাশিয়ানস আর কামিং! রাশিয়ানস আর কামিং!!' অবস্থা আর কি। কিন্তু রাশিয়ানরা আর আসে না।

ধরে নেই অবশেষে সত্যি সত্যি একদিন টিএন্ডটি'র মোবাইল ফোন বাজারে এল। ক্রেতারা সব আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করল এ ফোনে নানান রকম সুবিধা। সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে এই ফোন দিয়ে স্বর্গ-নরকে সরাসরি কথা বলা যায়। তো এক ক্রেতা ঐ ফোন কিনে তার নরকবাসী বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তাদের আলাপ জমে উঠায় তারা অনেকক্ষণ কথা বলল। হঠাৎ তার খেয়াল হল,

আরে হায় হায় এটাতো আই.এস.ডি কল নিশ্চয়ই অনেক বিল উঠেছে। সে ঠিক কত বিল উঠল জানার জন্য বন্ধুর সঙ্গে আলাপ শেষ করে কাস্টমার সার্ভিসে ফোন করল।

'আচ্ছা ভাই আমার নাম্বার এত আমি একটু আগে অনেকক্ষণ নরকে আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি... বিলটা ঠিক কত উঠেছে বলবেন?'

'এক মিনিট...হ্যাঁ বেশি না মাত্র ২০ টাকা।'

'কি বলছেন মাত্র বিশ টাকা? এত কম?!'

'হ্যাঁ বিশ টাকাই তো হবে এটাতো লোকাল কল!'

জুলফি সমাচার!

স্কুল জীবনের একটা গল্প বলি। কুমিল্লা জিলা স্কুলে ভর্তি হয়েছি ক্লাশ ফোরে। ক্লাশে আমিই অন্য স্কুল থেকে আসা একমাত্র নতুন ছাত্র। ক্লাশের ভাবগতিক ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, কোন স্যার কেমন। ক'দিন পর বিপদ টের পেলাম পঞ্চম পিরিয়ডে ধর্ম ক্লাশ। ঐ ক্লাশে সবাইকে বই দেখে দুপাতা আরবী পড়তে হয়। আমি আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলাম আমি ছাড়া প্রত্যেকটা ছাত্র আরবী পড়তে পারে। স্যারের সামনে গড় গড় করে করে আরবী পড়ছে বই দেখে। আর আমি পড়তে পারছি না, যথারীতি একদিন স্যারের মার খেলাম অভিনব মার। প্রথমে জুলফির চুল দু আঙ্গলে ধরে চিড়বিড় করা...তারপর বেত দিয়ে সপাসপ। বেতের বাড়ি সহ্য হলেও জুলফির চুলের চিড়বিড় টান অসহ্য। অচিরেই আমার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। খুব দ্রুত আরবি শিখে যে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব সেটাও সম্ভব না কারণ আরবী এত সহজ ভাষা না যে চট করে শিখে বিপদ থেকে উদ্ধার পাব। হতাশ হয়ে আমি আমার ভাগ্যকে মেনে নিলাম যেন। প্রায় প্রতিদিন ধর্ম স্যার জুলফির চুল ধরে টানেন। জুলফিতে টাক পড়ার অবস্থা! কিন্তু আমার কিছু করার নেই!

হঠাৎ একদিন আমি আবিষ্কার করলাম আমি ছাড়াও আরো দু'একজন মার খাচ্ছে। এটা কি করে সম্ভব? যে ছেলেটি গতকাল আরবী গড় গড় করে পড়ে গেল আজ সে পড়তে না পারার জন্যে মার খাচ্ছে কেন? হঠাৎ করেই আমি শার্লক হোমসের মতো আবিষ্কার করলাম যে আসলে আমাদের ক্লাশের কেউই আরবী পড়তে পারে না! তারা সবাই আগের দিন মুখস্থ করে আসে এবং স্যারের সামনে পরের দিন বই চোখের সামনে ধরে গড় গড় করে মুখস্থ বলে যায়! মানে পড়ার ভান করে। এখন কথা হচ্ছে ধর্ম স্যার কি ব্যাপারটা ধরতে পারেন না? অবশ্যই পারেন কিন্তু তিনিও যেন ভান করেন ছাত্ররা আরবী পড়ছে!

খুব শিঘ্রী আমিও গড় গড় করে আরবী পড়তে শুরু করলাম। মানে আগের দিন মুখস্ত করে এসে পরদিন বই সামনে ধরে পড়ার ভান করতে লাগলাম।

আমার জুলফি রক্ষা হল সে যাত্রা। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ঠিক মজার ব্যাপারও না বেদনার ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীর সব ধর্ম স্যাররাই কেন ছাত্রদের জুলফি ধরে টানাটানি করেন। জুলফির প্রতি তাদের এত ক্ষোভ কেন? এই নিয়ে একদিন আমি আমার বেশ কিছু জুলফিওয়ালা বন্ধুদের নিয়ে উন্মাদ অফিসে মিটিং এ বসলাম।

'তুই হঠাৎ করে বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম স্যার নিয়ে পড়লি কেন?'

'পড়লাম কারণ ঐ ধর্ম স্যারদের কারণে আমার জীবনে জুলফি রাখা হল না...দুই জুলফিতেই টাক পড়ে গেছে।'

পরে আমাদের জুলফি বিষয়ক গুরুগম্ভীর আলোচনায় যেটা বেরিয়ে আসল সেটা হচ্ছে—ধর্ম স্যারদের প্রায় সবারই শুধু থুতনীতে এক গোছা দাড়ি থাকে, জুলফিতে তাদের কোনো চুলই থাকে না। ফলে তারাও কখনো জুলফি রাখতে পারে না তাদের জীবনে। তাই তাদের এত ক্ষোভ!

সেই জুলফি আলোচনায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে এল সেটা হচ্ছে শুধু ধর্ম স্যার না অংক আর ড্রিল স্যাররাও ছাত্রদের সবচে' বেশি মারধর করে থাকে। অংক স্যাররা মারধর করে কারণ তাদের জীবনের অংক মেলেনি বলে অংকের উপর একটা ক্ষোভ আছে তাদের। আর ড্রিল স্যারদের বেলায় ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। এই স্যারদের তরুণ বয়সে একটা স্বপ্ন থাকে একদিন অলিম্পিকে যাবেন তিনি। দেশের জন্য স্বর্ণপদক ছিনিয়ে আনবেন কোনো একদিন। কিন্তু বাস্তবে উল্টো ঘটনা ঘটে...অর্থাৎ তার বিয়ের সোনার আংটিটাই ছিনতাই হয়ে যায় একদিন!

যথারীতি একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। প্রাইমারি স্কুলের এক তরুণ ড্রিল স্যারকে দেখা গেল একা একাই পোলভল্ট প্র্যাকটিস করছেন। তার কজন ছাত্র ব্যাপারটা দেখে দাঁড়াল।

'স্যার আপনি পোলভল্ট প্র্যাকটিস করছেন যে?'

'সামনে অলিম্পিক না?'

'ও আপনি অলিম্পিকে যাবেন?'

'ঠিক তা না।'

'তবে?'

'আরে গাধা অলিম্পিক দেখার জন্য স্টেডিয়ামের ভিতর ঢুকতে হবে না... টিকিটের যা দাম।'

উটোয়ালের উট

কোরবাণী ঈদের দিন সকারে আমার এক মালদার বন্ধুকে ফোন করলাম।

'কিরে খবর কি?'

'এই মাত্র ছাগল ফেললাম...'

'ঠিক আছে তুই ব্যস্ত পরে ফোন করছি।'

একটু পরে আবার ফোন করলাম, 'কিরে ফ্রি হয়েছিস?'

'না দোস্ত এই মাত্র গরু ফেললাম।'

'ঠিক আছে তুই এখনো ব্যস্ত পরে করছি...'

একটু পরে আবার ফোন করলাম, 'কিরে এখন কি অবস্থা?'

'এই মাত্র উট ফেললাম...'

আমি দেখলাম এ তো মহা সর্বনাশ! আমার ধনী বন্ধুটিতো দেশের পশু সম্পদ একে একে সব ফেলে দিচ্ছে মানে কোরবাণী করে ফেলছে। ভয়ে আর ফোন করলাম না তাকে।

উট নিয়ে কোরবাণীর একটা প্রায় সত্যি গল্প বলা যেতে পারে। এক লোক (এ অবশ্য আমার বন্ধু না) সে হঠাৎ করে কোরবাণী ঈদের আগে আগে একতলা বাসা ছেড়ে দোতালা বাসায় উঠে এল। তার এক বন্ধু তাকে ধরল।

'কিরে হঠাৎ ঈদের আগে বাসা বদল করলি? একতলা থেকে দোতালায়?'

'এবার উট কিনব যে?'

'উট কিনবি মানে?'

'মানে উট কোরবাণী দেব।'

'তার সঙ্গে দোতালা বাসায় সিফট করার সম্পর্ক কি?'

'কেন তুই কি উট দেখিস নি?'

'কেন দেখব না।'

'উটের গলাটা দেখেছিস? প্রায় জিরাফের মতো লম্বা তুই কি মনে করিস এক তলায় থেকে উট কোরবাণী দেয়া যাবে? উঠতো শুনেছি দাঁড় কিয়ে কোরবাণী করতে হয়... তাইতো দোতলা বাসা নিলাম...'

আমার লেখার ধরন দেখে মনে হতে পারে বুঝি সব উট বাংলাদেশেই কোরবাণী হয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই না। উট হচ্ছে রাজহাঁসের মতো এমন একটি প্রাণী যাকে হত্যা করতে মায়া হয়। প্রতিবাদহীন এই প্রাণীটি বড্ড নিরীহ। তো এই নিরীহ প্রাণীটি নিয়ে দান দান তিন দান শেষ একটি গল্প।

এক লোক। তার একটি গৃহপালিত উট আছে। সে সকালে উটটিকে ঘাস খেতে (অবশ্য উট ঘাস কায় কিনা ঠিক জানিনা) উটোয়াল থেকে বের করে দেয় (গরুর জন্য গোয়াল হলে উটের জন্য উটোয়াল!) একটু পরে খাবার তৈরি করে উটের পাত্রে রেখে টিনের দেয়ালে শব্দ করে উটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তো প্রতিদিন এই উট আকর্ষণী শব্দে বিরক্ত হয়ে একদিন তার প্রতিবেশী বলল–

'আচ্ছা বলুন তো প্রতিদিন টিনে বাড়ি দিয়ে ঐরকম বিশ্রি শব্দ কেন করেন?'

'আমার উটটাকে খাবার জন্য ডাকি।'

'মুখে শব্দ করে ডাকতে সমস্যা কি?'

'সমস্যা অবশ্যই আছে।'

'কি রকম?'

'এ বদমাশটা একদিন আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছিল তারপর থেকে ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি আমি।' বলে ঝন ঝন করে টিনে বাড়ি দিতে লাগলেন তিনি। দুপুরের খাবার সময় হয়েছে তার উটের!

বই বনাম বউ

অমর একুশের বইমেলা ২০০৪ শুরু হয়েছে। এবারের বই মেলায় সবচেয়ে উঁচু স্টলটি অন্য প্রকাশের। আর সবচেয়ে নিচু স্টলটি বোধহয় খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানির। মজার ব্যাপার হচ্ছে দুটো স্টলই পাশাপাশি। (অবশ্য খান ব্রাদার্সকে নিচু বলা ঠিক হল না, অন্য প্রকাশের প্রতি উচ্চ স্টলের পাশে তুলনামূলক অর্থে একটু নিচুই লাগছিল)।

খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানির মালিক ফিরোজ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। তিনি একটি মজার উক্তি করলেন। বললেন—

'প্রথম ও শেষ।'

জ্বি ঠিক বুঝলাম না।

'বলছি প্রথম এবং শেষ এবার পাশাপাশি।'

পরে বুঝলাম। হুমায়ূন আহমেদ তার প্রথম বই 'নন্দিত নরকে' দিয়েছিলেন খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানীকে আর এখন পর্যন্ত শেষ প্রকাশিত বই 'যদিও সন্ধ্যা' দিয়েছেন অন্য প্রকাশকে। প্রথম ও শেষ এই কারণে পাশাপাশি।

প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রিয় গান ছিল 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ'। তবে আমার ধারণা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ আসলে একটিই। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল ব্যাপী প্রিয় মাতৃভূমির ওজন কিন্তু মাত্র পয়ষট্টি হাজার গ্রাম! (পয়ষট্টি হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে) যদিও ট্রাকে লেখা থাকে সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টন।

দেশপ্রেমকে যেমন দাড়ি পাল্লায় মাপা যায় না সে রকম দেশকে তো নয়ই। তারপরও দুই দেশ প্রেমিক নিজেদের দেশপ্রেম নিয়ে কথা বলছিল–

'আমি আমার দেশকে এত ভালোবাসি যে বিয়েই করিনি।'

'দেশকে ভালোবাসার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কি?'

'যদি স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসতে গিয়ে দেশকে ভুলে যাই, তুই...?'

'আমি দেশকে এত ভালোবাসি যে সেটা বুঝাতে বিয়ে করেছি।'

'কিরকম?'

'আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি না। সে যখন জানতে চায় কেন তাকে ভালোবাসি না। তখন তাকে অন্তত বোঝাতে পারি যে দেশকে ভালোবাসার পর তোমার প্রতি আমার আর ভালোবাসা অবশিষ্ট নেই!'

প্রথম এবং শেষ একটি সত্যি গল্প দিয়ে শেষ করি। একুশের বইমেলায় এক ক্রেতা গেছে বই কিনতে।

'এমন একটা বই দিন মানে আমি এমন একটা বই আমার সংগ্রহে রাখতে চাই যেটা পড়ে আমি হাসতে পারি, কাঁদতে পারি... এমনকি যেন রেগেও উঠতে পারি।'

'সেক্ষেত্রে আপনি বই সংগ্রহ বাদ দিয়ে বরং একজন বউ সংগ্রহ করে নিন।'